শান্তিপথ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীফকিরচন্দ্র কুণ্ডু-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

নদীয়া, কুমারখালী হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৯ সাল, বৈশাখ।

মূল্য ॥০ আট আনা।

PRINTED BY T. N. HALDAR, PRINTER,

The Kamala Printing Works

3, Kashi Mitter's Ghat Street

CALCUTTA.

উৎসর্গ।

অজ্ঞান তিমিরান্ধনাশিনী

পরমব্রহ্মস্বরূপিণী

শ্রীগুরুর—

কৃপা প্রসাদে তৎপ্রদত্ত

নিত্যানন্দ-ধনের—

আনন্দকণিকা বিন্দুস্থবিন্দু

যাহা—

প্রাপ্ত হইয়াছি,

তাহা—

তৎ শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ

করিলাম।

শান্তি-ধারা।

"অনিত্য বিষয় যাহা, স্থায়িত্ব বিহীন,
নিত্য যাহা কভু তাহা না হয় বিলীন;
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি রয়েছেন যিনি,
জানিবে জগতে মাত্র অবিনাশী তিনি;
উৎপত্তি বিলয়শূন্য অব্যয় আত্মার,
বিনাশ করিতে পারে, হেন সাধ্য কার?
নিত্য আত্মা, দেহ তাঁর অনিত্য নিশ্চয়,
শোক ত্যজ, দেহনাশে কেন দুঃখোদয়?
জন্ম মৃত্যু নাহি তাঁর দেহের মতন,
বার বার নাহি করে জনম গ্রহণ।
পরিণাম শূন্য আত্মা, নাহি বৃদ্ধি ক্ষয়;
শরীর হইলে নষ্ট, বিনষ্ট না হয়।
জীর্ণবাস ছাড়ি যথা মানব-নিচয়,
নববস্ত্র পরিধান করে, ধনঞ্জয়!
সেইরূপ জীর্ণদেহ করি পরিহার,
নব কলেবর আত্মা ধরে পুনর্ব্বার।
শস্ত্র নারে করিবারে আত্মার ছেদন,
বহ্নি নাহি পারে তাঁরে করিতে দহন,
সলিলের সাধ্য নাই সিক্ত করিবারে,
অনিলের শক্তি নাই শুষ্ক করে তাঁরে;

ছিন্ন দগ্ধ সিক্ত শুষ্ক হইবার নয়,
অনাদি অমর আত্মা নিত্য সর্ব্বময়।
অব্যক্ত, অচিন্ত্য আত্মা, চিরনির্ব্বিকার,
এই জানি কর তুমি, শোক পরিহার।
নিত্য জন্মে, মরে আত্মা—মনে যদি হয়,
তথাপি করিতে শোক পার না নিশ্চয়;
মরিলেই জন্ম হয়, জন্মিলে মরণ!
অনিবার্য্য এই কাজে শোক কি কারণ?
আদিতে অব্যক্ত জীব, অব্যক্ত অন্তেতে,
মধ্যেতে দু'দিন ব্যক্ত, দুঃখ কিবা তাতে?
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ দেখেন আত্মায়,
কেহ বা আশ্চর্য্য অতি বলেন তাঁহায়;
কেহ বা আত্মার কথা শুনি চমৎকার,—
কেহ বা শুনিয়া তত্ত্ব নাহি পায় তাঁর।
জানিও, অবধ্য আত্মা সর্ব্ব দেহময়,—
মৃতজীব তরে দুঃখ করা কিছু নয়।
তোমাতে তাহাতে সর্ব্বজীবে এক হরি,
বৃথা কেন কর শোক ধৈর্য্য পরিহরি'?
আপন আত্মায় হের আত্মা সবাকার,
সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান কর পরিহার।"

ভূমিকা।

"মন্দকবিঃ যশঃপ্রার্থী,
গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ,
উদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

আমার মত জ্ঞানহীন ব্যক্তির ধর্ম্ম বিষয়ে লিখিতে ইচ্ছা করা, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন তুল্য। পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনে বলবতী ইচ্ছা হইলে, সে যেমন তখন কৃতকার্য্যতার বিষয় না ভাবিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী হয়, আমারও ঠিক ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অনেক সময় মনে নানাপ্রকার ধর্ম্মবিষয় আংশিকরূপে চিন্তা উদয় হইয়া, আবার ক্ষণমধ্যে বিলীন হইত। এক বিষয় সম্পূর্ণ বুঝিবার পূর্ব্বে সে চিন্তা অন্তর্হিত হইয়া অন্য চিন্তার উদয় হওয়াতে, সময়ে অতিশয় অশান্তির কারণ হইত। ঐ কারণেই পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনে অগ্রসর হওয়া। প্রথমতঃ দুই চারি পৃষ্ঠা লিখিবার পর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, পদ্ধতিমত চলিতেছি কিনা? তৎপর সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অনেক অনুসন্ধানের পর, কোন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ ঘটে; ঐ মহাত্মাকে আমি সকল কথা বলি এবং পাণ্ডুলিপিগুলি দেখাই; তিনি ঐ সকল পাণ্ডুলিপি মনযোগসহকারে আদ্যোপান্ত দেখিয়া বলেন যে "পদ্ধতি ছাড়া কোন স্থান হয় নাই, তবে শব্দগত অর্থের বিপর্য্যয় আছে, তাহা হউক তুমি লিখিতে থাক, পরে আমি সকল দেখিয়া দিব।" তাঁহার উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, আমার মনে যেরূপ আন্দোলন হইত,

সকল যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হই। গিরি উল্লঙ্ঘনে পঙ্গু অসমর্থ হইলেও, সে যেমন তাহার বলবতী ইচ্ছাবশে সাধ্যমত গিরিপথের কিয়দ্দূরও অগ্রসর হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি মহাজ্ঞান সমুদ্রে সন্তরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলেও, যদি পদমাত্রও সমুদ্র উদ্দেশে ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলেও জীবন সার্থক মনে করিব।

কুমারখালী।
ফাল্গুন, ১৩১৮।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণ অল্পদিনেই নিঃশেষিত হওয়ায় কতিপয় সহৃদয় মহানুভব ব্যক্তির উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, এই সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংস্করণ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রিত হইল। আমি অতিরিক্ত পরিশ্রমে অপারগ হেতু, মদীয় পূজনীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মৈত্রেয় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা এতৎসংস্করণের মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিদান স্বরূপ, স্নেহপাশে তাঁহার নিকট আমি চিরআবদ্ধ রহিলাম।

কুমারখালী;
অক্ষয়তৃতীয়া।
বৈশাখ, ১৩১৯।

গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

শান্তি-পথ।

জীব ও জগৎ।

এক সূত্রে ও একই নিয়মে, জীব ও জগতের ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। ইহাতে কোনই পার্থক্য নাই। জগতস্থিত ক্রিয়া ও গুণের সহিত, জীবদেহের গুণ ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। জগৎ যে উপাদানে সৃষ্ট হইয়া, যে নিয়মে চলিতেছে, জীবদেহসকলও, সেই উপাদানে গঠিত হইয়া, সেই ক্রমে চালিত হইতেছে। জীবশরীরে যেমন প্রাণবায়ুর ক্রিয়া আছে, জগতেও সেইরূপ প্রাণবায়ুর ক্রিয়া হইতেছে। সূর্য্য যেমন জগতের তেজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, বায়ু চালিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইতেছে, তদ্রূপ জীবশরীরেও ঐ সূর্য্যতেজ আংশিকরূপে অবস্থান

করিয়া, প্রাণবায়ুর দ্বারা ক্রিয়াশীল হইতেছে। জীবশরীরে প্রাণ, অপানবায়ু-সংযোগে ক্রিয়াশীল তেজে ক্ষুধা উৎপন্ন হইয়া, আহারীয় বস্তুসকল পরিপাক দ্বারা যেরূপ শরীরস্থ পঞ্চভূতের পুষ্টি সাধন করে, জগতস্থিত সংকোচ প্রসারণ বায়ুতে, ক্রিয়াশীল তেজ দ্বারা, জগতের যাবৎ ত্যাজ্য প্রাণ, পদার্থসকল পরিপাক করিয়া সেইরূপ জগতস্থ পঞ্চমহাভূতে মিশাইয়া লয়। জীব-সমূহ সমস্ত দিবসের কার্য্যের পর রাত্রিতে যেমন বিশ্রাম লাভ করে, জগতও তেমনি দিবাভাগে কার্য্য করিয়া, রাত্রিতে বিশ্রাম লইয়া থাকে। জীবসমূহের মধ্যে যেমন কতক দিবাতে নিদ্রিত থাকিয়া, রাত্রিকালে কার্য্যে রত হয়, জগতেরও তেমন দিবাভাগে তদ্‌গুণ-সকল হীন-ক্রিয় থাকিয়া, নিশাকালে অধিক ক্রিয়াশীল হয়। দিবাভাগে রজোগুণের, অপেক্ষাকৃত আধিক্য লক্ষিত হয়; এবং নিশাতেও তদ্রূপ তমোগুণের আধিক্য হইয়া থাকে। রজোগুণে সুখ-দুঃখাদি কার্য্যে নিয়োজিত করে, এবং তমোগুণে ভ্রম-প্রমাদাদি কার্য্যে, নিক্ষেপ করে। তমোগুণাধিক জীবসকল, রাত্রিতেই গতায়াত করিয়া থাকে, ও তাহাদের তমোগুণোদ্ভব ক্রোধাদি বৃত্তিসকল

ভয়ানক প্রবল হয়। নিশাকালে জগতের তমোগুণাধিক্য বশতঃ, ঐ গুণসম্ভূত জীবসকল, তদ্‌কালে জাগরিত হয়। জীব-শরীরে যাহার যে গুণের আধিক্য আছে, জগতের সেই গুণাধিক্য সময়েই, সেই জীবসকল সতেজ বোধ করিয়া থাকে; এবং তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিশাতে জগৎ ভয়ানকত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়াই, তদাচারী জীবসকল তদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকে।

জীব ও জগৎ, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই প্রধান গুণত্রয়-মিশ্রণে ক্রিয়াশীল। জগতের প্রাণের আধার সত্ত্বগুণ, অর্থাৎ আকাশ-তত্ত্ব ও তদুৎপন্ন বায়ু। মনের আধার রজোগুণ, অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব; এবং শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের আধার তমোগুণ, বা অহঙ্কার তত্ত্ব। এই অহং তত্ত্বে জগৎ প্রকাশ পাইয়াছে; আবার ঐ তত্ত্ব অভাবে জগৎ লয় হইবে। জীবের পক্ষে প্রাণের আধার সত্ত্বগুণ, মনের আধার রজোগুণ, এবং "আমি" বুদ্ধির আধার, তমোগুণ। সত্ত্বগুণে নির্লিপ্ততা, রজোগুণে কার্য্যশীলতা, এবং তমোগুণে, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের বোধ আছে। রজোগুণাধিক্যে নিত্য নবভাব, ও সেই ভাবে পুনঃপুনঃ জন্ম, সত্ত্বগুণে স্থিতি, এবং তমোগুণাধিক্যে,

অজ্ঞানতা ও সেই ভাবে মৃত্যু। জীবশরীরে তিন গুণ সমান থাকে না; কার্য্য কারণ বশতঃ গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জীব সকল জন্ম গ্রহণ পর শিশুকাল হইতে যে গুণের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সেই গুণের ক্রিয়া অধিক করায়, পরে ঐ গুণের বিকাশ অধিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন গুণ অল্লাধিক থাকিলেও, বর্ত্তমান জন্মের গুণ সঙ্গ হেতু তাহা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে আর একটা বিষয় বুঝিবার আছে যে, সকল জীবই যদি প্রধান তিনগুণে সৃষ্ট হইল, তবে জীবসমূহের মধ্যে, মানবের এত পার্থক্য কেন? অন্যান্য জীব সমুদয় হইতে মানবের একটা বিশেষত্ব এই যে, মানব পরাবুদ্ধির ভাব উপলব্ধি করিতে পারে। **'আমি'** বোধ ত্যাগে যে ভাব থাকে, তাহাই পরাবুদ্ধি; এই বোধ, অন্য কোন জীবের নাই, মানবের আছে, তাই মানব সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ। পরাবুদ্ধি বোধবিহীন মানবে এবং অন্যান্য জীব সমূহে কোনই পার্থক্য নাই। যে মানবের এই পরাবুদ্ধির বোধ যত অধিক জন্মায়, তিনি তত অধিক মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মনুষ্যত্ব যে কি তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

জীবের মৃত্যু এবং জগতের লয় ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। জগৎ, পঞ্চ মহাভূতের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে; সেই পরিমাণ স্থিতি থাকিয়া সময়ে লয় প্রাপ্ত হইবে। জীব সকল ঐ পঞ্চ মহাভূতের অসংখ্য কণিকাবিন্দনুবিন্দুর একত্র সংমিশ্রণ, তাহা কতকাল আর স্থিতি থাকিতে পারে? যেমন জলরাশির মধ্যে অসংখ্য বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া, আবার তৎক্ষণাৎ মিশাইয়া যায়, সেইরূপ জীব সকল জগতে বুদ্বুদ আকারে উঠিয়া, অবশেষে পঞ্চমহাভূতে লীন হয়।

ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব।

ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মের অণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড অণ্ডসদৃশ গোলাকার, তজ্জন্য ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ, অর্থাৎ চৈতন্য বা সঙ্কল্পিত সত্তা এবং নির্গুণ বা সঙ্কল্প বিহীন সত্তা। নির্গুণ বা নির্ব্বিকল্প সত্তায় অহংজ্ঞান থাকে না, আর সগুণ বা চৈতন্য সত্তায় অহং জ্ঞানে সৃষ্টি কার্য্য চালিত হয়; আবার কেবল মাত্র নির্ব্বিকল্প ভাবে সৃষ্টি ক্রিয়া থাকে না;—কেবল প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম যখন ধ্বনিত হইতে থাকে, তাহাকেই মহাপ্রলয় বলে। সৃষ্টি কার্য্যে সবিকল্প বা পরিবর্ত্তনশীলতা ও নির্ব্বিকল্প বা আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন-শীলতা, এই উভয় সত্তায় ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন এবং মহাপ্রলয়ে কেবল মাত্র নির্ব্বিকল্প সত্তায় অবস্থিত থাকেন। সাধন কার্য্যেও সাধক, সমাধিতে ঐ দুই প্রকার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যতক্ষণ ভক্ত—ভগবান পর্য্যন্তও সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ সাধক সগুণে থাকেন, সেই পর্য্যন্ত

তাহার বিচ্ছেদ, মিলনরূপ সুখ দুঃখ ভোগ থাকে। তৎ-পরবর্ত্তী সোপানে, ভক্ত-ভগবান সম্বন্ধও রহিত হইয়া যায়, তখন সুখ-দুঃখ, বিচ্ছেদ-মিলন, ঘাতপ্রতিঘাত প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত অবস্থা, তাহাকেই নির্ব্বিকল্প ভাব বলে। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড কি কি উপাদানে গঠিত, তাহার উল্লেখ করা যাক্।

মহাপ্রলয় অন্তে, চৈতন্য উন্মেষে অহংজ্ঞানে অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করিব এই সংকল্পে যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন প্রণবরূপী শব্দব্রহ্ম, সৃষ্টি মানসে সৃষ্ট্যুপযোগী ব্যোম, পরে মরুৎ, অতঃপর সেই মরুৎ বিকৃত হইয়া তেজ, তদপর তেজ বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপ্ এবং অপ্ বিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিতে পরিণত হইলেন। এই পাঁচটীকে পঞ্চ মহাভূত বলে। এই মহা-ভূতগণের অনেক গুণ আছে। শব্দের আধার ব্যোম, তাহার একমাত্র গুণ শব্দ; মরুতের দুইটী গুণ,—শব্দ ও স্পর্শ; তেজের তিন গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ; অপের চারি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস; ক্ষিতির পাঁচ গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ইহারা বিকল্প রহিত বা অপরিবর্ত্তনীয়, নিজের কোন সঙ্কল্প নাই, চৈতন্যের সংযোগেই ক্রিয়াশীল। এই একত্রিত পঞ্চ মহাভূতের

আংশিক সংযোগে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু বিকাশ পাইতেছে এবং ঐ নির্ব্বিকল্প পাঞ্চভৌতিক যৌগিক-বস্তুতে ব্রহ্ম সবিকল্প ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভব খেলা খেলিতেছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধগম্য হয়, ভগবানের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভাবের পরস্পর ক্রিয়াতেই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। এই মহাক্রিয়ার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, নির্ব্বিকল্প ভাব হইতে সবিকল্প ভাব প্রকাশ হইয়াই, পুনরায় নির্ব্বিকল্প ভাবাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই ক্রিয়া তাৎপর্য্যেই ব্রহ্মাণ্ডের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হইতেছে।

দেবতা-তত্ত্ব।

মহা প্রলয়ে ব্রহ্ম এক মাত্র নির্ব্বিকল্প ভাবে যখন অবস্থিতি করেন তখন তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্; তিনি পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন। তৎপর সৃষ্টিকালে ঐ অদ্বিতীয় ভাব, দ্বিতীয় ভাবে পরিণত হয়; সে ভাবকে সবিকল্প বা সগুণ বলে। নির্ব্বিকল্প ভাবে সবিকল্প ভাব আসিলে, তখন নির্ব্বিকল্প ভাবকে পুরুষ এবং সবিকল্প ভাবকে প্রকৃতি বলে। সগুণ বা সঙ্কল্প ভাবে প্রধান তিন গুণ বিদ্যমান আছে এবং ঐ গুণত্রয়ের ক্রিয়ানুসারে সত্ব, রজঃ, তমঃ বা বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সৃষ্টিকরী স্থিতিকরী ও ধ্বংসকরী, এই তিন সঙ্কল্পে জগতের প্রকাশ। সগুণে আসিয়া প্রথমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইল। শব্দের আধার ব্যোমে—শব্দের দেবতা প্রণব, মরুতের দেবতা পবন, তেজের দেবতা অগ্নি, অপের দেবতা বরুণ এবং ক্ষিতির

দেবতা ইন্দ্র, তৎপর মরুৎ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হইয়া, উনপঞ্চাশ গুণানুসারে নাম ধারণ করিয়াছেন। তেজ একাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া, একাদশ গুণানুসারে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুই অনাদি পুরুষের বিভূতি। তাই সকল বস্তুই পূজনীয় ও প্রণম্য। তবে বিভূতি সকল স্বয়ং চৈতন্য নহে। বলিতে পার তবে নানা প্রকার দেব-দেবী ও শিলা মূর্ত্তি ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে কেন? মানুষ ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকিয়া কদাচ ঈশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে না, সেই জন্য মনোমত ও মনোহর সীমাবদ্ধ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বিবেচনা করিতে হয় এবং তদ্‌মূর্ত্তিকে এক মনে ধারণা অভ্যাস করিতে করিতে, নিজে চৈতন্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন নিজ চৈতন্য-বলে সকল বস্তুতেই চৈতন্য-স্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে; ইহাই সাধনার মূল। আর একটী কথা এই, শিলামূর্ত্তি মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলামূর্ত্তি উভয়ই সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ক্রিয়ার ভাবসূচক। শালগ্রামশিলা নির্ব্বিকল্প ভাবের প্রতীক; অতএব ইহার সাধনও নিষ্কাম এবং লিঙ্গমূর্ত্তি সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প

উভয় সংযোগে, সৃষ্টি প্রকরণের প্রতীক অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে সর্ব্বদা সৃষ্টি প্রকরণের প্রতীক অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে সর্ব্বদা সৃষ্টি ক্রিয়া হইতেছে; ইহার সাধনা সকাম নিষ্কাম উভয়তঃ।

দেহ-তত্ত্ব।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহের অনেক সামঞ্জস্য আছে, এই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্মাণ্ড যে পঞ্চমহাভূতে গঠিত, তোমার এই দেহও সেই পঞ্চ মহাভূতের আংশিক সংযোগে গঠিত। চৈতন্য সংস্পর্শে চেতনার দ্বারা ক্রিয়াশীল জীব-আখ্যা ধারণ করিয়াছেন, এবং ঐ চেতনা ত্যাগেই দেহ নিষ্ক্রিয় বা মৃত আখ্যায়িত হয়। নির্বিকল্প দেহ যখন সবিকল্প ভাবে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন নির্বিকল্প পঞ্চভূত ক্রিয়াশীল হয়। বলবান যেমন দুর্ব্বলকে আক্রমণ করে, অগ্নি যেমন বায়ুকে আকর্ষণ করে, ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পঞ্চমহাভূতগণও তাহার আংশিক পঞ্চভূত সকলকে সেইরূপ আকর্ষণ করিতেছে। একত্রিত পঞ্চভূত জীব-শরীরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ-ক্ষেত্রের আধার ইন্দ্রিয় এই নাম ধারণ করিয়াছে। চক্ষে রূপ, কর্ণে শব্দ, নাসিকায় গন্ধ, জিহ্বায় রস এবং ত্বকে

স্পর্শ সুখ পাইবার জন্য ইন্দ্রিয়গণ দিবরাত্রি লালায়িত। সবিকল্পভাব বা অহংজ্ঞানে আমি কর্ত্তা (আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি ইত্যাকার জ্ঞানে) ঐ সকল আস্বাদনাদি স্পর্শ সুখ সকল বৃদ্ধি করিতে গিয়া, নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করি। বয়োবৃদ্ধির সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই অহং জ্ঞানে ক্ষণস্থায়ী পাঞ্চ-ভৌতিক বস্তুকে চিরস্থায়ী বা বহু কাল স্থায়ী হইবে সঙ্কল্প করিয়া দুঃসহ যন্ত্রণায় পতিত হই, সেই জন্য শিশু বা বালক অপেক্ষা বৃদ্ধদের আকর্ষণ বা মায়া অধিক লক্ষিত হয়। পঞ্চ মহাভূতগণ যখন চিরস্থায়ী নহে, তখন তাহার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কনিকা বিন্দুর সহস্রাংশের একাংশেরও তুল্য নহে, এমন যে পাঞ্চ-যৌগিক দেহ, যে কত অল্প সময় স্থায়ী, তাহা একবারও চিন্তা করি না। নির্ব্বিকল্প দেহকে সবিকল্প জ্ঞান করা, অর্থাৎ এই দেহই আমি বা আত্মা অর্থাৎ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় বোধই, সকল সুখ দুঃখ উৎপত্তির হেতু স্বরূপ।

চৈতন্য স্বরূপ ভগবান দেহ-বুদ্ধি সম্পান্ন হইয়া, জীব-আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। দেহ হইতে আত্মার পৃথক জ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞানের সোপান। এই নির্লিপ্ত জ্ঞানাশ্রয়ে

ভগবান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়া করিতেছেন। এক হইতে বহু পরিনতিকে যখন স্বেচ্ছায় পৃথক পৃথক সত্ত্বা বলিয়া বো করে, তখন মানব যথার্থই দেখে যে, সেই অন বিভিন্নতা এক মহাশক্তির আশ্রয়ে ক্রীড়া করিতেছেন এই লীলাময়ী শক্তিই শ্রীভগবান। সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সবিকল্প নির্ব্বিকল্পের ক্রিয়া মাত্র; দেহেতে যেরূপ আধি ব্যাধি নানা প্রকার উৎপীড়ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ ঝড় বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, নানা প্রকার উৎপাত হইয়া থাকে; দেহেতে যেমন চৈতন্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি তেমন নির্ব্বিকল্প ভাবে সবিকল্পভাব বর্ত্তমান থাকিয় ক্রিয়া করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডও চিরস্থায়ী নহে, দেহও চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্মাণ্ডও যখন প্রকাশ হইয়াই সঙ্কো অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তখন আমি তুমি কোন কথা? তুমি আমি কিছু ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া নহে। তবে ভগবান মানবের প্রতি অসীম দয়া করিয়া, পঞ্চ মহাভূতের মহানির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে, মানব ইচ্ছা করিলে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে, তাহার পথ বলিয়া দিয়াছেন। নির্ব্বাণে আর গতায়াত থাকে না; তখন চৈতন্য স্বরূপে, স্ব-রূপ মিশাইয়া যায়। এই অবস্থা লাভের জন্যই সাধন

ভজন. যোগ, তপস্যা। মানব, সকল জীবের শ্রেষ্ঠ ; কারণ, মানব মাত্রেই আত্মাকে স্বস্থানে লইতে কিছু না কিছু চেষ্টা করে ; তাই মানব মাত্রেই ঈশ্বর বিশ্বাসী। আত্মাকে স্বস্থানে লওয়া বড় সহজ নহে, কারণ, সৃষ্টির মূলেই অহং ভাবের প্রকাশ। সেই অহং ভাব ছিন্ন করিতে হইলে, সৃষ্টি কার্য্য ক্রমশঃ আয়ত্বাধীন করিতে হয়। তবে দয়াময়, দীনহীন জীবের প্রতি তাঁহার অসীম দয়াগুণে, অতি সহজ পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "মানবগণ! তোমরা ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, পরিণামে অধোগতির নিম্নস্তরে পড়িও না। পৃথিবীর রূপ রস হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া আমার রূপ রসে ডুবাইতে অভ্যাস কর। আমি তোমাদিগকে যন্ত্রণা হইতে শান্তি-ছায়ায় লইব। শিশুকাল হইতে তুমি যে ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে ভালবাসা অভ্যাস করিয়াছ, কিন্তু ভাবিতেছ কি, মুহূর্ত্ত পরেই তোমার বড় আপনার বস্তু চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে, তখন তাহার জন্য শোকে উন্মত্ত প্রায় হইবে ; এমন কি আমার উপর দোষারোপ করিতেও ত্রুটি করিবে না। কিন্তু জাননা কি ? অগ্নি কখনও শীতল হয় না, সূর্য্য কিরণ কদাচ স্নিগ্ধ হয় না, মিথ্যা

কভু সত্য হয় না, ক্ষণস্থায়ী কখনও চিরস্থায়ী হয় না। তুমি যে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করিয়া ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে চিরস্থায়ী বোধ করিয়াছিলে, সে ত্রুটি একবার ভাবিয়া দেখ কি? সুতরাং বাতুলের ন্যায় আর অগ্নিকে শীতল বোধে ধরিতে যাইও না। যে অজ্ঞান পথ দিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া অভ্যাস করিয়াছ, সেই অজ্ঞান পথ দ্বারায় সত্য বস্তু অনুসন্ধান কর। পথ একই, কোনই কষ্ট হইবে না; কেবল একটা ত্যাগ, আর একটি আরম্ভ। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, অগ্নি কভু শীতল নহে, তাহার দাহিকা গুণ আছে।" অন্যান্য জীবের ভগবান কেবল অনর্থই দিয়াছেন, কিন্তু মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ দিয়াছেন। যদি ধর্ম্মকে ভিত্তি না করিয়া কেবল অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে সেই অর্থে অনর্থ ঘটায়। যদি পদ্ধতি মত পূর্ব্বে ধর্ম্মের ঘর হইয়া, অর্থাৎ সত্যাসত্য বিচার, করিয়া পরে, অর্থের সিঁড়িতে পদার্পণ করি তাহা হইলে অর্থই পরমার্থ পথে লইয়া যাইতে সহায়তা করে। সেই জন্যই পূর্ব্বকালে প্রথম অবস্থায় গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অসত্য, হিতাহিত ও কর্ম্মাকর্ম্ম শিক্ষা করিত, পরে মধ্য অবস্থায়, সদাচারে অর্থ উপার্জ্জন ও

দারপরিগ্রহণাদি করিয়া, সুখ-শান্তিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহানন্তর, শেষ অবস্থায় মোক্ষ পথে অগ্রসর হইত। বর্ত্তমানে শিশুকাল হইতে সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি অভাবে, মিথ্যা ও অহিত কার্য্যাদি অনুষ্ঠান করতঃ মধ্য অবস্থায় তাহার ফল স্বরূপ নানাপ্রকার অনর্থ ভোগ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। কালের ক্রমদ্রুত ধ্বংসাভিমুখী গতিতেই, দিন দিন এই প্রকার ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু সকলের ভিতর অনন্ত শক্তিরূপী ভগবান রহিয়াছেন; চেষ্টা করিলে কালের গতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারা যায়; অথবা কর্ম্মানুরূপ আয়ত্বাধীন ত হইবেই। কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী। কার্য্যের পূর্ব্বে, কি কার্য্য, কি অকার্য্য, তাহা বিচার দ্বারা জানা আবশ্যক, পরে অকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্য।

যে কোন কর্ম্মই হউক, সামর্থ্য ভিন্ন তাহা সম্পন্ন হয় না। যিনি যেরূপ শক্তিশালী, তিনি তত অধিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। সেই জন্য সাধনকার্য্যে তদুপযোগী সামর্থ্য আয়ত্ত করিবার জন্য, অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা, সামর্থ্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মচর্য্য পালনে, মনের উন্নত ভাব হইয়া, গৃহকর্ম্মে, অথবা সাধন কর্ম্মে, যে কার্য্যেই হউক, শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। একারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা, জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনা বা শক্তি উপাসনা, একই সাধনা। কেবল ভাষার পার্থক্য মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনকারী, প্রকৃত পক্ষে শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে। কারণ বীর্য্যই শক্তি-স্বরূপ। বীর্য্য সুপ্রতিষ্ঠ হইলে, সকল কর্ম্মই অনায়াসলব্ধ হয়।

শাস্ত্রে আছে :—

"ন তপস্তপ ইত্যাহুঃ ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদযস্তু স দেব নতু মানুষঃ ॥"

অর্থাৎ—ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ। যিনি ঊর্দ্ধরেতা, তিনি মানুষ নন, দেবতা। যে সাধনায় বীর্য্যপাত আছে, সে সাধনাকে কখনও শক্তি উপাসনা বলা যায় না। তবে যাঁহারা বলেন, তাহা তাঁহাদের স্বকল্পিত উক্তিমাত্র, কিন্তু শাস্ত্র সঙ্গত নহে।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন যে—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥"

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালের নিমিত্ত, এবং সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগকরার নাম ব্রহ্মচর্য্য। এমন যে সাধনা, তাহা কদাচ সহজসাধ্য নহে। সে কারণ, ব্রহ্মচর্য্য সাধনা, বা শক্তি-উপাসনা, বালককাল হইতে আরম্ভ না করিলে, তৎপর তাহা সুপ্রতিষ্ঠা করা বড় সহজ নহে। কেবল মাত্র পুস্তকাদি পাঠে, বা উপদেশ শ্রবণে, ব্রহ্মচর্য্য পালন হয় না। কোন কর্ম্মনিষ্ঠ বিজ্ঞ

ব্যক্তির বিশেষ তত্ত্বাবধানে ভক্তি সহকারে, নিয়ম সকলের বিশেষ অধীন থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষালাভ করিতে হয়। এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য পালন পথে, যে সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহা বলা যাউক :—

বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যধারণে শৌর্য্য, উৎসাহ এবং সামর্থ্য জন্মে। শুক্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়; এবং চিত্তের স্থিরতা জন্মিয়া, রাগদ্বেষাদি ও কামক্রোধাদি বৃত্তি সকল, স্বতঃই হ্রাস পাইয়া থাকে। পিতামাতার ব্রহ্মচর্য্য, প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তদসন্তানগণের ঐ পথ অপেক্ষাকৃত সহজায়ত্ব হইবে। সন্তানগণে তাঁহাদের ছায়ার আদর্শ পতিত হয়। বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক, পিতামাতা ঐ শিক্ষা সন্তানগণে প্রদান করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে, আমরা স্বভাবতঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি। বলহীন ব্যক্তির যেমন মনে নানারূপ কার্য্যের সংকল্প থাকিলেও, তৎকার্য্য সমুদয় সম্পন্নে পারগ হয় না, সেইরূপ, আজকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনে, সাতিশয় যত্নবান হইলেও, বলহীনতা হেতু, বীর্য্যধারণে নানাবিধ বাধা বিপত্তি উপস্থিত করে। তন্মধ্যে সুপ্তি-স্খলন, প্রধান অন্তরায় স্বরূপ। যত্ন চেষ্টায় অন্যান্য সকল বিপত্তি

হইতে রক্ষা পাইলেও, সুপ্তি-স্খলন হইতে নিস্তার পাওয়া সুকঠিন। কামক্রোধাদি রিপুবৃত্তি সকলের, প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অনুভব করা যায়। চেষ্টা দ্বারা সময়ে তাহাদিগকে দমন রাখা যাইতে পারে। কিন্তু সুপ্তি-স্খলনরূপ মহাশত্রু, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানকারীর পক্ষে, তদপেক্ষাও অধিক শত্রুতা করিয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় যে শত্রু তাহার অভীষ্ট সাধন করে, তদপেক্ষা ভয়ানক শত্রু আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্মচর্য্যে, ঐ অজ্ঞাত শত্রুকে অগ্রে দমন করিতে হইবে। তদপর অন্যান্য বাধা বিপত্তি সকল, সহজেই পরাজিত হইবে। সুপ্তি-স্খলনরূপ মহাশত্রু দমন করিতে হইলে, অগ্রে তাহার উৎপত্তি স্থান অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য; পরে, উৎপত্তি বিনাশে, উহারও বিনাশ সাধন হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক যে, কি কারণে সুপ্তি-স্খলন ঘটিয়া থাকে:—

যে শরীরে যে পরিমাণ তেজ ধারণ করিতে সক্ষম, তদপেক্ষা তেজের অস্বাভাবিক আধিক্য জন্মিলে, তাহার প্রতিক্রিয়া হয়। তাহাতেই, স্ত্রী সঙ্গ ও রেত স্খলনাদি লিপ্সা আনয়ন করে। দুর্ব্বল ব্যক্তির যেরূপ

ধারণা শক্তির হীনতা বশতঃ, অল্প তেজাস্বাভাবিকে, তাহার প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, অপেক্ষাকৃত বলশালী ব্যক্তির তেজ ধারণা সামর্থ্য, তদপেক্ষা অধিক থাকায়, তাহার সহজে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। সেই জন্য, বলশালী ব্যক্তি অপেক্ষা, হীনবল ব্যক্তির ঐ পীড়া অধিক লক্ষিত হয়।

তেজাস্বাভাবিকতা কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহাই এক্ষণে দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ, আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ হেতু, দ্বিতীয়তঃ মাতৃভাব ব্যতিত দুষ্যভাবের স্ত্রীসঙ্গ হেতু। ইহার অন্যান্য কারণ থাকিলেও, উক্ত কারণদ্বয়ই অন্যান্য কারণ সমূহের মূল।

আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণে, কি জন্য অস্বাভাবিক তেজোৎপন্ন করে, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। জীব-শরীরে নিয়মিত ভূক্ত দ্রব্য সকল সুপরিপাক অন্তে অগ্রে রস, পরে রক্ত, অতঃপর রক্তের সহস্রবিন্দু হইতে একবিন্দু তেজের উৎপন্ন হয়। ইহাই তেজের স্বাভাবিক উৎপত্তি। ইহাতে শারীরিক বা মানসিক ইষ্ট ব্যতীত, অনিষ্ট জন্মায় না। তৎপর অতি তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র, অতি অম্লাদি দ্রব্য ব্যবহারে, অথবা অতিরিক্ত

বা অনিয়মিত আহারে শরীরস্থ বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। কুপিত বায়ুর পরস্পর সংঘর্ষ হেতু, শরীরে অস্বাভাবিক তেজোৎপত্তি হইয়া থাকে। কুপিত বায়ুর উত্তেজনায়, যে তেজ জন্মায়, তাহা শরীরস্থ স্বাভাবিক তেজকে উত্তেজিত করায়। তেজাধিক্যকালে, জাগ্রতাবস্থায়, নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, ও কার্য্য দ্বারা ঐ অধিক তেজ সমতা পাইয়া থাকে; এবং নিদ্রতাবস্থায়, স্বাভাবিক তেজকে বাহিরে নিক্ষেপ করে। ইহাই আহারাদির গুণাগুণে সুপ্তি-স্খলনের মূল কারণ।

তৎপর স্ত্রীসঙ্গহেতু যে সুপ্তি-স্খলন ঘটিয়া থাকে, তাহারও কারণ কুপিত বায়ু। আহারীয় দ্রব্যাদির গুণাগুণে, যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা জন্মায়, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক স্ত্রী সংসর্গে উত্তেজনা বৃদ্ধি করায়। এই কারণ, স্ত্রীসংসর্গে যত অধিক তেজের হানি হয়, এমন তেজ হানিকর কার্য্য, আর দ্বিতীয় নাই। স্ত্রী সংসর্গে অধিক তেজহানি বশতঃ, পরিণামে এত অধিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া থাকে যে, চিন্তাহেতু উত্তেজনা ভাব আসিলেও, শরীরস্থ তেজ নির্গত হইয়া আইসে; এমন কি স্মরণ-মনন কার্য্যেও, ঐরূপ তেজহানি হইয়া

থাকে। ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীর স্ত্রীসংসর্গ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। কারণ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়, "বীর্য্যধারণং, ব্রহ্মচর্য্যম্" ইহাই মূল মন্ত্র।

গৃহীর পক্ষে নূন্যকল্পে পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাবৎ বীর্য্য প্রতিষ্ঠা স্থির রাখিতে পারিলে, মনের শক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া, বহু চিন্তাযুক্ত চিত্তকে, একচিন্তা বিষয়ে, স্বভাবতঃ কেন্দ্রীভূত করায়। তখন কোন প্রকার প্রলোভনে তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না। বালককাল হইতে অস্বাভাবিক উপায়ে তেজহানিকর কার্য্যদ্বারা, চিত্তবৃত্তি সকল হীনতা প্রাপ্ত হয়। তৎপর বিবাহান্তে, স্ত্রীসংসর্গে, আরও অধিক তেজোক্ষয় হেতু, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্তও লোপ পাইয়া থাকে। তখন অতিশয় ক্রূরমনা এবং রাগদ্বেষাদি ও কামক্রোধাদির বশতাপন্ন হইয়া, সংসার অশান্তির আবাসস্থল করিয়া তুলে। সকল আশ্রমেই, প্রথমাবস্থায়, ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য পালনীয়। অন্যথায় কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিবার সামর্থ্য জন্মে না।

ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানকারীর আসন অভ্যাস এবং স্নান আহারাদির কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়। নিয়মিত স্নান আহার দ্বারা, যত সময়ে সৎগুণ

সকলের বৃদ্ধি করে, আসন অভ্যাসে, তদপেক্ষা অল্প সময়ে, ঐ গুণ সকলের আধিক্য জন্মিয়া থাকে। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সহায়তা ব্যতীত, আসন অভ্যাস করা বিধেয় নহে। অন্যথায় অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অভাবে, যোড়াসন অথবা সরল পদ্মাসনে উপবেশন দ্বারা, নিত্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিলেও ঐরূপ শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। আসন অভ্যাস কালীন ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে কোন আসন হউক না কেন, সকল আসনেই, মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া বসিতে হইবে। যোগশাস্ত্রে বহুপ্রকার আসন উল্লিখিত আছে। সে সকল নিষ্প্রয়োজন বোধে এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। আবশ্যকীয় ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কয়েক প্রকার আসন লিখিত হইল।

সরল পদ্মাসন—বাম উরুর উপরে দক্ষিণপদ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদ রাখিয়া উভয় হাঁটুর উপর, উভয় হস্ত চিৎকরিয়া, ইষ্ট চিন্তা করিবে। ইহাই সরল পদ্মাসন।—

বদ্ধ পদ্মাসন—বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদ রাখিয়া, হস্তদ্বয় দ্বারা

পৃষ্টদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে, এবং বক্ষের উপর চিবুক ন্যস্ত করতঃ নাসাগ্রভাগ দর্শন করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশক।

স্বস্তিকাসন—জানু ও উরুর মধ্যস্থলে চরণতলদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক ঋজুকায় হইয়া উপবিষ্ট হইবে। ইহাই স্বস্তিকাসন।

মকরাসন—অধোবদনে শয়ন পূর্ব্বক, মৃত্তিকাতে বক্ষস্থল স্থাপন করতঃ পদদ্বয় বিস্তারিত করিয়া, হস্তদ্বারা মস্তক ধরিলেই মকরাসন হইয়া থাকে। এই আসন অভ্যাসদ্বারা শরীরস্থ তেজ ও জঠরাগ্নি প্রবল করে।

ভুজঙ্গাসন—নাভি হইতে পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত দেহের অধোভাগ, ভূতলে সংস্থাপন করতঃ, করতল যুগলদ্বারা, মৃত্তিকা আশ্রয় পূর্ব্বক, সর্পের ন্যায় শিরোভাগ উর্দ্ধে সমুত্তোলন করিলেই, ভুজঙ্গাসন হয়। এই আসন অভ্যাসদ্বারা শরীরস্থ অগ্নি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন।

তদপর স্নানাহারাদির নিয়ম পালনে, যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহার কিয়দংশ মাত্র উল্লেখ করা গেল।—

নিদ্রাত্যাগবিধি—পঞ্জিকায় লিখিত প্রত্যেক দিনের সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট পূর্ব্বে, উঠিতেই হইবে।

নেত্র মুখাদি মর্দ্দন—শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে, উভয় হস্ত তিন চারিবার একত্রে ঘর্ষণ করতঃ, চিৎকরিয়া, উভয় হস্ত দ্বারা কপাল, গণ্ডস্থল ও নেত্র উপরের দিক হইতে নিচের দিকে মর্দ্দন করিবে। এই কার্য্যে নিদ্রালস্যতা শীঘ্রই দূর হয়।

গাত্রোত্থান—ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে উঠিয়া বসিবে। তদপর সস্তিকাসনে অথবা অধিকারানুরূপ আসনে, উপবেশন করতঃ, ভ্রূমধ্যস্থলে, জ্যোতিরভ্যন্তরস্থ ইষ্ট মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। ঐ আসনে বসিয়াই, ধীরে ধীরে নিশ্বাস বায়ু ভিতরের দিকে টানিতে থাকিবে, ও সাধ্যানুসারে ক্রমে অধিক সময় পর্য্যন্ত, বায়ু ভিতরে টানিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু কদাচ দম বন্দ করিয়া থাকিবে না। নাসিকা দ্বারা ঐ বায়ু টানিবার সঙ্গে, মূল মন্ত্র মনেমনে স্মরণ করিবে। পরে ধীরে ধীরে ঐ নিশ্বাস বায়ু রেচণ করিবে। ঐ সঙ্গেও মূল মন্ত্র স্মরণ আবশ্যক। অদীক্ষিতের পক্ষে * "প্রণব" অথবা "নমঃ" এই মন্ত্র স্মরণেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

* অধিকারানুসারে।

শয্যাত্যাগ বিধি—তদপর পুরুষ প্রথমে দক্ষিণ পদ, এবং স্ত্রী জাতি বাম পদ ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। এবং অগ্নি, ভাগ্যবতী স্ত্রী, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য দর্শন করিবে।

বিন্মূত্র ত্যাগ—তদপর মৌন ভাবে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে। বেগ বোধ না হইলে, বা সন্ধিকালে, মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। মলমূত্র ত্যাগ কালে. জল-পাত্রস্পর্শ, হাঁই তোলা ও হাঁচি দেওয়া নিষিদ্ধ। বল্মীক, গোচারণ-মাঠ, জীর্ণ-ইষ্টকালয়, ভস্ম, পথ, চষাভূমি, চিতা, জীবযুক্ত-গর্ত্ত, জল ও নদীতীর, এই সমস্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ।

শৌচাচরণ—যাবৎ দুর্গন্ধ দূর না হয়, তাবৎ মৃত্তিকা লেপন দ্বারা হস্ত পদাদি পুনঃপুনঃ ধৌত করিবে। তদপর তৃণাদিদ্বারা নখভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাদি অপসারিত করিবে।

দন্তধাবন—তিক্ত, কষায়, কটু, কণ্টকিত, বা ক্ষীর-যুক্ত সরস কাষ্ঠই দন্তধাবনে প্রশস্ত। বিহিত কাষ্ঠের অভাবে, চূর্ণাদি দ্রব্যে দন্ত মার্জ্জন করিবে। কেবলমাত্র লবণ, মৃত্তিকা, লোষ্ট্রক, অঙ্গার ও অঙ্গুলী দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিবে না। দন্তকাষ্ঠ বা চূর্ণাদির

অভাবে দ্বাদশ গণ্ডুষ জল দ্বারা মুখ ধৌত করা কর্ত্তব্য। ভুক্ত বস্তুর কোন অংশ দন্তে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকিলে, যদি স্বাদ অনুভূত না হয়, তাহা হইলে তাহা বহিস্করণার্থ বিশেষ চেষ্টা করিবে না। কারণ তাহাতে রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা।

স্নান—স্রোতজলে স্রোতের অভিমুখে, এবং স্রোত রহিত জলে, সূর্য্যের অভিমুখে, নাভিমগ্ন জলে দাঁড়াইয়া, হস্তদ্বয় দ্বারা মুখ, নাক ও কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক, ডুব দিবে। জলে পাদক্ষেপনের পূর্ব্বে, গঙ্গা-যমুনাদি তীর্থ সকলের নাম স্মরণ পূর্ব্বক, মস্তকে জল প্রদান করিবে। স্নানান্তে গুরু-উপদেশানুষায়ী ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিবে।

আহার পদ্ধতি—আহার কালে, সর্ব্বদা সূর্য্যমুখী হইয়া বসা উচিত। পবিত্র স্থানে পূতঃ বস্ত্রে, বিশুদ্ধ মনে আহার করিবে। আহার কালে, প্রথমতঃ দ্রব-পদার্থ, মধ্যে কঠিন দ্রব্য, এবং সর্ব্বশেষে পুনরায় দ্রব-পদার্থ ভোজন করিতে হয়। প্রথমে, মধুররস, তদপরে লবণ, তদনন্তর অম্ল, অবশেষে তিক্তরস সেবন শাস্ত্র সম্মত। অন্নের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া, পঞ্চদেবতার নিমিত্ত, পঞ্চভাগে অন্ন মাটিতে রাখিয়া দিবে। পরে দক্ষিণ হস্তে গণ্ডুষ পরিমাণ

জল লইয়া, নমঃ নাগায় স্বাহা, নমঃ কূর্ম্মায় স্বাহা, নমঃ কৃকরায় স্বাহা, নমঃ দেবদত্তায় স্বাহা, নমঃ ধনঞ্জয় স্বাহা, এই মন্ত্র সমূহ উচ্চারণ করিয়া ঐ পঞ্চভাগোপরি দিবে। উদ্গারে, নাগবায়ু, উন্মীলনে, কূর্ম্মবায়ু, হাঁচিতে, কৃকরবায়ু, জৃম্ভনে, দেবদত্ত বায়ু এবং সর্ব্বদেহে, ধনঞ্জয়বায়ু অধিকার করিয়া অবস্থান করে। আহার কালে ঐ সকল বায়ুর উপদ্রব হইতে, শান্তি কল্পনা করিয়া, পঞ্চগ্রাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। তদপর প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান, এই পঞ্চ বায়ুর শান্তি কল্পনা করিয়া যথাবিধি মুদ্রা দ্বারা বিনা লবণে পঞ্চগ্রাস অন্ন গ্রহণ করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে ভোজ্য বস্তু সকল অভীষ্ট দেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক, আহার করিবে। আহারান্তে মুখশুদ্ধি হেতু হরিতকিই প্রশস্ত। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনকারীর, তামাকাদি মাদক দ্রব্য সেবন, ও দিবানিদ্রা, একেবারে নিষিদ্ধ। তবে শারীরিক অসুখাদিতে এই সকল নিয়মে বাধা থাকিবার আবশ্যক নাই।

ব্যায়াম—বৈকালে কিছু সময় ভ্রমণাদি অথবা কোনরূপ শারীর পরিচালন ক্রিয়া দ্বারা, ব্যায়াম কার্য্য সম্পন্ন করিবে। নিয়মিত ব্যায়াম কার্য্যে, শরীর ও মনের

স্বাভাবিক উন্নতি বিধান করে। যে কোন প্রকার ব্যায়াম কালে. শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিজায়ত্ব রাখিবে ; অর্থাৎ, পরিশ্রম সময়ে, শ্বাসের গতি বৃদ্ধি অবস্থায়, তাহা নাসাদ্বারা বেগে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না। অথবা মুখ দ্বারা পরিত্যাগ করিবে না। তৎকালে মুখ চাপিয়া রাখিয়া, কেবলমাত্র নাসাদ্বয় দ্বারা, ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ব্যায়াম কালে বেগে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগে, অথবা মুখ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস লইলে, শরীরস্থিত বায়ুর গতি অস্বাভাবিক করিয়া, নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করে। সেই কারণে, অনেক সময় নিয়মিত ব্যায়াম ক্রিয়া করিয়াও, অনেককে জটিল ব্যাধিক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তত্ত্বাবধান ব্যতীত, কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না ; এবং তাহাতে নানাবিধ কুফল দর্শাইয়া থাকে। সেই হেতু কেবলমাত্র পুস্তকাদি পাঠে, কোন ক্রিয়া সম্পাদন চেষ্টা না করিয়া, অগ্রে তৎকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য।

সাধন সোপান ।

আজ কাল সচরাচর শান্তি-সুখ অন্বেষণে অল্প-বিস্তর সৎকার্য্য করিতে, অনেকেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন দেখা যায়। তন্মধ্যে কতক ব্যক্তি আবার কোন কোন ধর্ম্ম পুস্তকাদি দেখিয়া, নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে অল্পবয়স্ক বালকই অধিক। কোন বালক হয়ত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নিজ ইচ্ছামত কালী, কৃষ্ণ, রাম এই প্রকার কয়েক খানি চিত্র-মূর্ত্তি সম্মুখে বসাইয়া, সকাল বেলা কিছু ফুল লইয়া বসিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। দিবারাত্রিতে ঐ একবার বসা মাত্র। যাহাহউক এই সকল কার্য্য, মন্দের ভাল স্বীকার করি; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপথে দিন দিন অগ্রগামী হওয়া, বা ধর্ম্মমার্গের যে সুবিমল শান্তির ছায়া আছে, তাহা অনুভব করা, তাহাদের ভাগ্যে দুরাশা মাত্র। ধর্ম্ম পথের প্রথম সোপান যারপরনাই কষ্টকর। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন

"ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইলে প্রথম কার্য্য সকল বিষপান তুল্য কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়; তৎপর কিছুদূর কোনক্রমে অগ্রসর হইতে পারিলে, ক্রমে আনন্দ জন্মিতে থাকে; পরে ঐ আনন্দ, মহানন্দে পরিণত হয়।" অধর্ম্ম পথ ঠিক ইহার বিপরীত। প্রথমতঃ বেশ সুখ সচ্ছন্দ; মনে হয়, এমন ভাবে সারাজীবন কাটিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা ঘটে না। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না; অধর্ম্ম অর্থাৎ মিথ্যা, যাহা একভাবে স্থায়ী নহে, এমন বস্তু কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি বহন করিতে পারে না; তাই দুই দিন বা দশ দিন অগ্রে বা পশ্চাতে হউক, সকল সুখ-সচ্ছন্দ কোথায় চলিয়া যায়; তখন সকল সুখ-শান্তি বিষময় হইয়া উঠে।

মানব মাত্রেরই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া স্বভাবসিদ্ধ, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসও স্বাভাবিক। সকল কার্য্যেই গুরু প্রয়োজন, প্রধানতঃ শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরু; এই উভয় গুরুকরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যেমন কর্ণধার ব্যতীত শুধু ক্ষেপণী ক্ষেপন দ্বারা নৌকা ইচ্ছানুরূপ গন্তব্যপথে চালান যায় না, সেইরূপ, এই ভবপারাবারে যাইতে হইলেও কর্ণধারের

প্রয়োজন। আমি দাঁড়ী মাত্র, কেবল দাঁড় টানিব, (কার্য্য করিয়া যাইব,) কিন্তু হাল ধরিবে সেই গুরু বা গুরুমন্ত্র। হাল ধরিয়া যেমন নৌকার গতি সোজা রাখিতে হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মপথেও গুরুমন্ত্রে কেবল লক্ষ্য স্থির রাখিতে হয়। সাধন পথে যে ক্রিয়া-কাণ্ডই কর, মন প্রাণ যেন সর্ব্বদা মন্ত্রদেবতার চরণে স্থির থাকে। কোন্ কর্ম্ম দ্বারা এই সদা-চঞ্চল মন এক বিষয়ে স্থির রাখা যাইতে পারে, প্রথমতঃ তাহাই, শিক্ষা করা আবশ্যক। সাধন পথে যম, নিয়ম, আসন, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এই সকল সোপানে, পর পর পদ বিক্ষেপ ব্যতীত, কদাচ মন স্থির হয় না; এই পথ ব্যতীত যাহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, তাহাদের ভাগ্যে সাধনের শান্তি-ছায়া কদাচ পাইবার আশা থাকে না।

যম।

যম—অর্থাৎ বিচার, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্য-মিথ্যা, ইহার বিচার দ্বারা সত্য নির্ণয় করাকে যম বলে। যাহা পঞ্চইন্দ্রিয়ের বোধগম্য সে সকলই মিথ্যা; এবং এই পঞ্চইন্দ্রিয়গণের অতীত এক অতীন্দ্রিয় অবস্থা আছে,

তাহাতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ জ্ঞান হয়, সে আনন্দের বিন্দু-মাত্র স্ফূরণ হইলেও কি যে এক অদ্ভুত হর্ষ-বেগ উপস্থিত হয়, তাহা কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে কোন দিন কোন মুহূর্ত্তও যদি লাভ হইয়া থাকে, তবে তিনিই জানেন, নচেৎ তাহা মন ও বাক্যের অতীত। সাধন দ্বারা সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুকে লাভ করিতে হইবে। এখন বলিতে পার যে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা কার্য্য করণের আবশ্যক কি? মনের সহিত দেহের ওত-প্রোত ভাবে সম্বন্ধ। কারণ, মনের বাসনা অনুরূপ এই বাসনাময় দেহ সৃষ্ট হয়। ভগবানের এমনি সৃষ্টি-কৌশল যে, পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকে পঞ্চমহাভূতগণ সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে, এই আকর্ষণ বা টানের নাম "মায়া"। সাধন পথে প্রকৃতির গতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয় তাই সাধক গাহিয়াছেন;—"আয় মা সাধন সমরে"। ভেদ-বুদ্ধি থাকিতে তুমি প্রকৃতির উপর হইয়া কখনও চলিতে পারিবে না। প্রকৃতিস্থ রূপ, রস, গন্ধে সর্ব্বদা তোমাকে মাতোয়ারা করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতির অধীন থাকিলে, হস্ত পদাদির কার্য্য করিতেই হইবে। যদি তুমি জোর করিয়া হস্ত পদাদির দ্বারা কার্য্য না কর, তাহা হইলেও

তোমার মনে সকল কার্য্যই হইতে থাকিবে; হস্ত পদাদির দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে বরং কিছু অধিক সময় লাগিত, কিন্তু মনে তদপেক্ষা আরও ত্বরিৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতে লাগিল। কায়িক কার্য্য অপেক্ষা মানসিক কার্য্যে অনিষ্ট অধিক। কায়িক কার্য্য জ্বলন্ত অগ্নি এবং মানসিক কার্য্য তুষাগ্নি তুল্য; সেই হেতু সাধন পথে প্রকৃতির সহিত মিল দিয়া চলিতে হয়। যে প্রকৃতিতে তুমি অধোগতির শেষ সীমায় গিয়াছ, আবার সেই প্রকৃতির সহায়তায়েই উর্দ্ধ গতির চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইবে। যে হস্ত পদ সর্ব্বদা নিজের ও পরিবারবর্গের কার্য্যে সতত ব্যাপৃত রাখিতে, এক্ষণে সে সকলকে ভগবৎ বোধ-রূপ কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সেই জন্য, পূর্ব্বে মহর্ষিগণ ফল, পুষ্প, ধূপ, চন্দনাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির গুণের যখন কার্য্য করা অবশ্যম্ভাবী, তখন ভগবানের পূজা অর্চ্চনাদি কার্য্যে ইন্দ্রিয় সকল সংযোগ অভ্যাস করিবে। প্রথমতঃ মন কিছুতেই ইচ্ছুক হইবেনা, একবার যদি বলে "হাঁ," এইরূপই করিব তৎপরক্ষণে, আবার দশবার বলিয়া বসিবে "না," এমন কঠিন কার্য্য কি মানুষ কখনও করিতে পারে? তবে যাহার

করেন, তাঁহারা দেবতুল্য ব্যক্তি। এত মনের প্রথমকার অবস্থা; তখন কেবল হস্ত পদাদিকে ফল-পুষ্প চয়ন, দেবতা দর্শন ইত্যাদিতে খাটাইতে হইবে, সেই সময় সকলই কেবল কায়িক, মনের কিছুই নহে। যে কার্য্য সর্ব্বদা বা অধিক সময় করা যায়, তাহাতে প্রকৃতির গতিতেই মনের যোগ হইয়া থাকে। যখন অভ্যাস বশতঃ কার্য্য দ্বারা ভগবৎ কার্য্যে মনঃসংযোগ হইবে, তখন বুঝিবে যে, প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছ। মনকে অন্যান্য চিন্তা হইতে সংযত করিয়া, ভগবৎ কার্য্যে সংযোগ করিবার প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ, অভ্যাসই একমাত্র উপায়। তৎপর আর একটা লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক, বিশেষ, পূজা আহ্নিকের সময়, একমাত্র মন্ত্রানুরূপ ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ব্যতীত, অন্য কোন মূর্ত্তি তথায় না থাকে। কারণ, সাধনার মূল উদ্দেশ্যই মন এক বিষয়ে ন্যস্ত করা। স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে শিক্ষা অবস্থায় গণ্ডির মধ্যে রাখা আবশ্যক। তৎপর যখন মন ইষ্টদেবতায় স্থির হইবে, তখন সকল গণ্ডি ছিন্ন হইয়া যাইবে। কারণ মন সর্ব্বদা নানা চিন্তায় রত থাকে। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে এক এক প্রকার চিন্তার উদয় হইতেছে। চিন্তার গতি অন্তর্দিকে ফিরাইয়া দেখিলে,

বুঝিতে পারা যায় যে, চক্ষের পলকও কিছু সময় স্থির থাকে, কিন্তু মনের গতি তদপেক্ষাও অস্থির। এমন যে সদা-অস্থির মন, তাহাকে স্থির করাই সাধন পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি যতদূর সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার মনেরও তত স্থিরতা জন্মিয়াছে। মনস্থিরতার সহিত সাধন রহস্যও নিজে বুঝিতে পারা যায়। মনস্থিরতার সহিত অন্তর্দৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাই, নিত্যানন্দময়ের নিত্যলীলার অনন্ত আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য অকার্য্য বিচার দ্বারা, অকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে বীতরাগ রূপ রজ্জুতে সংযত করিয়া, কার্য্যে নিয়মিত করিতে হয়।

সংযম।

যম অর্থাৎ—সংযম, অর্থ সংযত করা। যেমন সারথী, অশ্বকে বল্গা দ্বারা সংযত করিয়া তাহার গন্তব্য পথে রথ চালিত করে, সেইরূপ এই দেহরূপ রথে মন-সারথী পার্থিব বস্তুতে, যাহা ক্ষণিক সুখদায়ক, কিন্তু পরে বিষ তুল্য, এমন বস্তুতে বীতরাগরূপ বল্গা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ

রূপ অশ্বগণকে সংযত করিয়া, অভীষ্ট পথে পরিচালন করাকেই সংযম বলে। যে অশ্ব বহু দিন স্বেচ্ছামত আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, তাহাকে রথে যোজনা করিলে, সে প্রথমে যেমন সে কার্য্য করিতে কিছুতেই স্বীকার পায়না, নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ করে, তৎপর আহার কমাইয়া ও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া, পরে তাহাকে এমন বশ করে যে, এমন কি বিনা বন্ধনেও চালাইতে সমর্থ হইয়া থাকে। সংযম ব্যাপারেও, ঠিক ঐ প্রকার কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খলতা বিশেষে, সময়ে অধিক বেগ পাইতে হয়; সকল ইন্দ্রিয় সমান বলশালী হয় না; কোনটা হয়ত অল্প আয়াসে বশীভূত হয়, আবার কোনটী বশীভূত করিতে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই কারণ তাহাদিগকে বীতরাগ রূপ রজ্জুতে বাঁধিয়া নিয়মে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য। অগ্রে বাঁধা না পড়িলে, তাহারা নিয়ম পালনে কদাচ স্বীকৃত হইবে না। অশ্ব বাঁধিবার রজ্জু নানা প্রকারে সংগ্রহ হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের বন্ধন-রজ্জু একমাত্র বীতরাগ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। যাহার পার্থিব ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে

যত অধিক বীতরাগ, তাহার রজ্জুও তত শক্ত এবং ত
কার্য্যকারী। স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গণকে, স্ব-ইচ্ছা
পরিচালন ইচ্ছা করিলে, অগ্রে রজ্জুটী কার্য্যোপযোগী
করিয়া, পরে নিয়মে বাধ্য করিবে; কিন্তু ইহা মনে
রাখিতে হইবে যে, শুষ্ক-বৈরাগ্য অধিক কার্য্যকারী না হইয়
বরং বিঘ্নোৎপাদন করে।

নিয়ম।

সাধন পথে নিয়ম সকল অবশ্য পালনীয়। শ্রীভগবান
গীতাতে বলিয়াছেন "অতি নিদ্রা বা অনিদ্রা, অতি ভোক্তা
বা উপবাসীর যোগ হয় না।" যোগ অর্থে অতি কঠি
ও অসাধারণ কার্য্য মনে করিও না। যোগেই দেহধারণ
মনের পার্থিব বিষয়ে বাসনা যোগ হওয়াতে জন্মগ্রহণ;
তৎপর বাসনা মত পুত্রকলত্রাদি ও ধনজনের সহিত
স্থূলে যোগ হইয়া বাসনা ভোগ, সেই বহু বাসনাকে
একমাত্র বাসনায় যোগ করাকে সাধন-যোগ বলে।
এক বাসনা ব্যতীত, যদি মনে দুইটী বাসনাও থাকে, তাহা
হইলেও তাহার সকল সাধন-ভজন ফলদায়ক হয় না;
সুতরাং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সকল ইন্দ্রিয়কেই

ভগবানের কর্ম্মে খাটাইতে হইবে এবং বাসনাকেও তাঁহাকে পাইবার জন্য লালায়িত করিতে হইবে। সাধন পথে অকর্ম্মকে নিয়মিত করিয়া, কর্ম্মে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। আহার-নিদ্রা এই দুইটী অগ্রে নিয়মিত করা আবশ্যক।

আহার-নিদ্রা। প্রথমতঃ আহার। অযথা আহারে শরীরস্থ শুদ্ধগুণ সকল নষ্ট করিয়া, প্রমাদ আলস্য প্রভৃতি আনয়ন করে। আহার নিয়মিত করিলে নিদ্রা আপনি নিয়মিত হয়। পূর্ণ আহারে আলস্য আনয়ন করে, আলস্যে নিদ্রা জন্মায়, সেই কারণ আহার বিষয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বলিয়াছে, "যে পরিমিত খাদ্য খাইলে পূর্ণ আহার বোধ করা যায়, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ আহার করিবে। অপর এক ভাগ জল দ্বারা পূরণ করিবে; এবং শেষ ভাগ বায়ু চলাচলের জন্য খালি রাখিবে; তাহা হইলে নিরোগী ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে"। সাধন পথে, বেলা দ্বিপ্রহরের আহার ঐ প্রকার নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য, প্রথমে মনে হয় যে, অর্দ্ধ আহার করিয়া কি প্রকারে বাঁচিতে পারা যায়! কিন্তু অল্প আহারে মন যে কি প্রকার শান্তভাবাপন্ন থাকে, তাহা অভ্যাসকারীই জানেন। প্রথম কয়েক দিন ঐরূপ আহার নিয়মিত

করিতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরে তাহার সুফল বুঝিতে পারা যায়। যে কোন অভ্যাস আরম্ভ সময়ে এই মনে করিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়গণ স্ফূর্ত্তির জন্য যাহা চায়, তাহা কদাচ দিব না; কারণ ইন্দ্রিয়গণকে প্রশ্রয় দিলে তাহারা মনের প্রজ্ঞাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিগ্রহ করিয়া, সাধন পথের কাজ সকল করাইতে হইবে, কর্ম্মারম্ভে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যেমন কোন জন্তুকে পোষ মানাইতে হইলে প্রথমে তাহার আহার কম করিয়া, পরে তাহাকে যেমন বলা যায় সে তেমনি করিতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব-ইচ্ছায় চালনা করিতে হইলে, পূর্ব্বে তাহাদের আহার কম দিতে হয়; আহারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সে কারণ আহারাদি বিষয়ে দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিবেচনায় গ্রহণ কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ঝাল, লবণ, অম্ল এবং তিক্ত দ্রব্য অতিরিক্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ; ঐ সকল দ্রব্য বেশী মাত্রায় আহারে, ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা আনয়ন করে। সুতরাং ক্রমশঃ মাত্রা কমাইতে আরম্ভ অভ্যাস করিবে। সকল কর্ম্মই দিনে দিনে অল্পে অল্পে অভ্যাস আবশ্যক। একবারে বা একদিনে কদাচ কোন কার্য্য আরম্ভ বা সম্পন্ন

করিবে না। অতিরিক্ত গরমে থাকিয়া যেমন হঠাৎ ঠাণ্ডায় যাওয়া হিতকারী নহে, সেইরূপ অনেক দিনের অভ্যাস সকল, কদাচ একবারে ত্যাগ করা ইষ্টপ্রদ নহে। মৎস্য, মাংস, পেঁয়াজ, রশুনাদির ঘ্রাণ হইতে দূরে থাকা উচিত; কারণ, এই সকলের গুণ উত্তেজনাপূর্ণ।* আতব তণ্ডুল, সৈন্ধব, গব্যঘৃত, বল্কা দুগ্ধাদি নির্লোভ হইয়া, অর্থাৎ আহার কালীন এই দ্রব্যটী বেশ সুস্বাদু হইয়াছে, অপরটী একটু ঘৃত সম্ভার দিলে ভাল হইত, ইত্যাকার কল্পনা মনে স্থান দিবে না। সর্ব্বদা যে কর্ত্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছ, সেই পথের নিয়মের কথা স্মরণ অভ্যাস করিও; তাহা হইলে কার্য্য সকল অতি সহজে আয়ত্তে আসিবে।

শয্যাত্যাগ।—তৎপর রাত্রে অতি লঘু আহার আবশ্যক; কারণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সময়ে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে। লঘু আহার করিলে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানে কোন কষ্ট বোধ হইবে না, বরং স্ব-ইচ্ছায় উঠিতে অভিলাষ জন্মিবে। সময়ে নিদ্রাত্যাগ জন্য পৃথক কোন কার্য্য আবশ্যক হইবে

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিলে অনেক উপকার আছে। সাধন কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্যের সহায়, ঐ সময় প্রকৃতি হইতে পাওয়া যায়; ঐ সময় প্রকৃতি, প্রকৃত স্থির-ভাবাপন্ন থাকেন এবং জীব মাত্রেই তখন স্থির ভাব ধারণ করিয়া থাকে। স্থিরতাই যাঁহার আকাঙ্ক্ষিত, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত তাঁহার পক্ষে মিত্র তুল্য। মহাত্মাগণ নির্জ্জন বাসের যে উপদেশ দেন, তাহার উদ্দেশ্য, স্থির মহাভাবের আভাস উপলব্ধি জন্য। শান্ত ভাবের শান্তি-সুখ কণিকা মাত্রও অনুভব করিতে পারিলে, তাহা বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টান্বিত হইবে। নির্জ্জন বাসে যে মহাভাবের আভাস বহুদিন বাসের পর উপলব্ধি হয়, তাহা এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সময়ের ভাব উপলব্ধি করা, সাধারণ জীবভাগ্যে সম্ভবপর নহে—কারণ, তাহা মুহূর্ত্ত মাত্র স্থায়ী। এত অল্প সময়ের ভাব দর্শন করা স্থূলদৃষ্টির কার্য্য নহে। উষাকালের আভাস এবং রাত্রের আভাসের সংমিশ্রণ সময়কেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে। ঐ সময়ে প্রকৃতি প্রকৃত মহাভাবাপন্ন থাকেন; সকল স্থির, স্তব্ধ, বোধ হয় পৃথিবী নিষ্ক্রিয়, তখন কি যে শান্ত মহাভাব মনে ভাসিয়া উঠে তাহা উপলব্ধি করিবার বিষয়।

প্রাতঃকৃত্য।—নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে ভগবানের মহিমাগুণগান অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি দয়ার সাগর, দয়া করিয়া জীবে দর্শন দিয়া সকল যন্ত্রণা মোচন করিবার জন্য নিয়ত সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যখন দেখিতেছেন, জীব নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আর কোন সঙ্গ নাই, তখনই তিনি দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আমরা এমন হতভাগ্য যে, যন্ত্রণাপূর্ণ মিথ্যা-সঙ্গ ত্যাগ সঙ্কল্প মনে আনিতেও ভয় করি। পুত্রপরিজন সঙ্গী বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও আর একজন এমন সঙ্গী আছেন, যিনি শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে, জন্ম-মৃত্যুতেও সাথের সাথী; সকল সঙ্গ ইচ্ছা করিলেও, অন্ততঃ কিছু সময় জন্য ত্যাগ করা যাইতে পারে; কিন্তু "আমি" এই অহংকাররূপ সঙ্গকে ত্যাগ করা বড় সহজসাধ্য কার্য্য নহে। পুত্রপরিজনের সঙ্গ করিয়া ভগবান দর্শনে কোন ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু "আমি" ভাবের একটু কণামাত্রও সঙ্গে থাকিলে, ভগবান দর্শনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইবে; এই কারণ, "আমি" "আমার" সংযুক্ত বাক্য, ক্রমে ক্রমে যত ত্যাগ অভ্যাস করিবে, তাহাতে ভগবৎসঙ্গ তত নিকটবর্ত্তী হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। এই প্রকার ভগবান প্রাপ্তি বিষয়ে আলোচনা, ও তাঁহার গুণগান করিয়া, গত

দিনে কি কি কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী হইয়াছিল, সেইগুলি স্মরণ করিবে; এবং অদ্যকার দিনে সে সকল কার্য্যে আর কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে; তৎপর শয্যা ত্যাগ অন্তে বাহিরে আসিয়া স্থির চিত্তে কিছুক্ষণ প্রকৃতির মহাভাব দর্শন করিয়া, শৌচাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে, অভ্যাসানুযায়ী বা স্বাস্থ্য-অনুরূপ স্নান অথবা গাত্র ও হস্ত পদাদি উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিয়া ফেলিবে। বাহ্য শৌচে স্বাস্থ্য অনুযায়ী যাহা সহ্য হয় তাহাই করণীয়। আন্তরিক অপবিত্র ভাব সকল সমূলে উৎপাটন করিয়া, পবিত্রতা অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত শৌচ-কর্ম্ম; নচেৎ সমস্ত গঙ্গোদক, গিরি প্রমাণ মৃত্তিকা এবং আমরণ কাল পর্য্যন্ত স্নান এই সমস্ত কার্য্য করিলেও ভাবদুষ্ট ব্যক্তি কদাচ পবিত্র হইতে পারে না। তৎপর সময়োপযোগী গাত্র আবরণ দিয়া পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া নিত্যকৃত্য আহ্নিকে বসিবে। আহ্নিক সময় পুষ্প চন্দনাদি, পানীয় জল এবং নৈবেদ্য স্বরূপ কিঞ্চিৎ মিষ্ট দ্রব্য অবশ্য লইবে। আহ্নিক কার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, সাধ্যমত বাক্য সংযমী হওয়া কর্ত্তব্য; বিশেষ আবশ্যকীয় কথার সংক্ষেপে দুই এক কথার উত্তর দিয়া সম্পন্ন করিবে। কারণ

শয্যাত্যাগ অবধি এ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্যাদি করিয়া মনের কথঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিয়াছ, তাহা কথান্তরে ক্রোধে পরিণত হইলে, সকল পরিশ্রম বৃথা করিয়া দিবে; বাক্য সংযমে অশেষ উপকার আছে।

আসন।

সাধন অঙ্গে নানাপ্রকার আসন কথিত আছে। গুরু ব্যতীত সেই সকল শিক্ষা হয় না, অন্যথায় নানাপ্রকার ব্যাধি আনয়ন করে; সেই জন্য সংসারে থাকিয়া সাধারণতঃ যোড়াসন অভ্যাসই শ্রেষ্ঠ। আমাদের যোড়াসনে বসা স্বাভাবিক বলিয়াই, এই আসন অভ্যাস সহজসাধ্য হয়; যে আসনই হউক, আসন স্থির করাই প্রধান কার্য। মেরুদণ্ড সরল ও স্থিরভাবে দেহকে ঠিক সোজা করিয়া যথাস্থানে হস্ত পদ স্থাপন পূর্ব্বক, স্থিরভাবে থাকার নাম আসন। প্রথমতঃ যখন যে কোন কার্য্যে বসিবে, তখন ঐ প্রকার আসন করিয়া বসিয়া সাংসারিক কার্য্যাদি করিলেও আসন স্থিরতায় অনেক সাহায্য হইয়া থাকে; নিয়মাদির পর, আসন স্থির-অভ্যাস আবশ্যক, আসন অভ্যাস না হইলে, অল্পক্ষণ বসিলেই কোমর

ধরিয়া যাইবে; অথবা পশ্চাৎদিকে বেদনাদি উপস্থিত হইয়া, চিত্তচাঞ্চল্য জন্মাইবে। স্বভাবতঃ বসিবার কালীন যোড়াসনে দেহ সোজা রাখিয়া বসিতে অভ্যাস করিবে। আসন স্থিরতার সহিত জপের মাত্রা অধিক করিতে পারিবে; আসন যত সময় পরিমাণ স্থির হইবে, জপের সংখ্যাও সেই পরিমাণ করা আবশ্যক। নচেৎ বসিতে কষ্ট বোধ হইলে, জপে কদাচ মনঃসংযোগ হইবে না।

ধ্যান।

ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে কল্পনাচক্ষু দ্বারা দর্শন করাকেই ধ্যান বলে; জপ ক্রিয়াই ধ্যেয়বস্তুর প্রাণ স্বরূপ। জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সর্ব্বদা অজপাজপ চলিতেছে। জপ অর্থ, কোন চিন্তা যতক্ষণ মনে স্থান পায়; এবং অজপা অর্থ ঐ চিন্তা মন হইতে চলিয়া গেলে, অন্য চিন্তা আসিবার পূর্ব্ব সময়। ইহাকে সবিকল্প নির্বিকল্প ভাবের ক্রিয়া বলে; এই ক্রিয়াতেই জগৎ প্রকাশ, আমিও প্রকাশ। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অজপা অপেক্ষা জপের ক্রিয়া অধিক স্থায়ী। পার্থিব মিথ্যা বস্তু সর্ব্বদা জপ করাতেই, সংসারে যাতায়াত; এই

জপ ক্রিয়া যে দিন অজপা অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পে মিশিবে, সেই দিনেই গতায়াত রহিত হইবে, সেইজন্য মিথ্যা বস্তু জপের স্থলে, সাধন কার্য্যে, একমাত্র সত্য বস্তুতে জপ অভ্যাস করিতে হয়, পরে সত্যই সত্যধামে লইয়া যায়। জপ ক্রিয়াই সাধনার বস্তু। যেই মন্ত্র, সেই দেবতা, ইহা যেন ঠিক স্থির বিশ্বাস থাকে। ভগবানের ভাব অনন্ত, সুতরাং রূপও অনন্ত। যিনি যে মূর্ত্তিতে ভজনা করেন, তিনি তদ্রূপ ভাবানুগামী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। মন্ত্রই স্বয়ং ইষ্ট-দেবতা; মন্ত্র জপের সঙ্গে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন অভ্যাস আবশ্যক; ইষ্টদেবতার কোন চিত্রপটাদি চক্ষে পড়িলে যে ভাব অনুভূত হয়, তদ্রূপ দেবতার রূপ ভাবিয়া মন্ত্র স্মরণাভ্যাস করিবে। যত প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড ও তপোবিধি আছে, তৎসমস্ত জপ ক্রিয়ার কণা মাত্রও নহে; জপ ক্রিয়াই, সকল ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ জানিবে। জপ তিন প্রকার; বাচিক, উপাংশু এবং মানসিক। জপকালীন শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহাকে বাচিক জপ বলে, আর, শব্দ উচ্চারিত না হইয়া, যদি ওষ্ঠ মাত্র স্পন্দন হয়, তাহাকে উপাংশু জপ বলে এবং উভয় প্রকার, শব্দ বা ওষ্ঠ স্পন্দন না হইয়া, কেবলমাত্র

মনে ইষ্টরূপ ভাবের পুনঃ পুনঃ আলোড়ণ করাকে, মানস জপ বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা, উপাংশু জপে শতগুণ ফল; এবং মানসিক জপে, উপাংশু জপ অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল অধিক। ক্রমশঃ উত্তম পথে অগ্রসর হইতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। দৈনিক জপের নিম্নসংখ্যা * শতাষ্ট, উৰ্দ্ধসংখ্যা একাসনে সাধারণতঃ তিন সহস্র। তৎপর আসন স্থির অনুরূপ পুরশ্চরণাদি করিয়া, জপসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়; এমন অবস্থায়, আসন স্থির অনুযায়ী শতাষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ তিন সহস্র পর্য্যন্ত একাসনে জপসংখ্যা অভ্যাস আবশ্যক। দৈনিক ত্রিসন্ধ্যা, পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে, আহ্নিক করা কর্ত্তব্য। অপারগ পক্ষে সকাল ও সন্ধ্যা, দুই বেলা একান্ত বিধি। দ্বিপ্রহরে কিছু না করিলেও, আসন করিয়া বসিয়া, অন্ততঃ ধৰ্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থ পাঠে চিত্তস্থিরতার পথে, অধিক অগ্রসর করাইয়া দেয়। কারণ, গ্রন্থ পাঠ সময়ে, তদবিষয় বুঝিবার নিমিত্ত, চিত্ত তাহাতে নিপুণ হইয়া থাকে। চিত্তের ঐরূপ নিপুণতা, প্রথমাবস্থায় অন্য কোন কার্য্যে কদাচ হয় না। সে কারণ,

* মতান্তরে দশধা।

নিজ ধর্ম্মানুযায়ী লিখিত বিষয়ের গ্রন্থাদি, পাঠ করা কর্ত্তব্য। অপর ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠে, চিত্তের নিপুণতা অভ্যাস হইলেও, তাহাতে স্বীয় ইষ্টাভিমুখী চিত্তের গতিকে, প্রতিহত করিয়া থাকে। তজ্জন্য, বিচার পূর্ব্বক গ্রন্থাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য। জপ সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আসন স্থিরতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে; আসন স্থির না থাকিলে, জপ ইষ্টকারী হইবে না। জপে বসিবার পূর্ব্বে, পূজাদি পদ্ধতি মত সম্পাদন করিবে। প্রাণায়ামাদি কার্য্য সকল, গুরু ব্যতীরেকে অভ্যাস করিবে না; অন্যথায় প্রাণের অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। প্রাণায়াম অর্থ, প্রাণকে আয়াস করা; আহার বিহারে ইন্দ্রিয়ের আয়াস হয় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের কিছুই আয়াস নাই; একমাত্র প্রাণায়াম ব্যতীত প্রাণের আয়াস অর্থাৎ আনন্দ, অন্য কোন প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে না; যাহাতে প্রাণানন্দ জন্মায়, এমন কার্য্য সহজসাধ্য নহে, ইহা নিশ্চয়। প্রাণায়ামের অগ্রে, নিজে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি খুব মনোযোগ সহকারে বুঝিতে হয়, যে কত সময় শ্বাস টানিয়া লইলাম, কত সময় স্থিতি থাকিল এবং কত সময়ই বা রেচন হইতে লাগিল; অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচকের স্বাভাবিক গতি পূর্ব্বে ঠিক বুঝিবার আবশ্যক। শ্বাসের স্বাভাবিক গতি যত

সময় পূরণ হইতে লাগিবে, তাহার চতুর্গুণ সময় স্থিতি থাকিবে এবং স্থিতির অর্দ্ধ সময়ে রেচন কার্য্য হইবে। নানা বিষয়ে চিন্তা বশতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বভাবতঃ অনিয়মিত থাকে; ঐ ক্রিয়াকে নিয়মিত করাই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। নিয়ম সংযমাদি দ্বারা, ভগবৎবিষয়ে চিন্তা অভ্যাস করিলে, প্রাণায়াম আপনা হইতেই হইয়া থাকে, পৃথক অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। প্রথম অবস্থায় জপকালীন ধ্যেয়বস্তুতে মনঃসংযোগ হইবে না, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানাপ্রকার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল সকল হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া, তোমার ধ্যেয়-বস্তুকে সরাইয়া দিবে; তাহাতে কদাচ হতাশ হইবে না, বরং ঐ সকল বিঘ্ন স্বরূপ কার্য্যকে, অন্তরের সহিত ঘৃণা করতঃ হটাইয়া দিবে, দেখিবে, দিনে দিনে সকল বিঘ্ন সরিয়া গিয়া, তোমার সাধিতবস্তু স্থান অধিকার করিতেছে। দিবারাত্র যত বেশী সময় ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে রাখিতে যত্ন চেষ্টা করিবে, তত শীঘ্র তিনি হৃদয়-মন্দিরে প্রকাশ পাইবেন। যোগ বল, সাধন বল, সকলের মূলপথ, অভ্যাস। যত বেশী সময় যে কার্য্য অভ্যাস করিবে, তত শীঘ্র সেই কার্য্যের ফল দর্শাইবে; স্বভাবজাত অভ্যাস সকল পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা ইষ্টদেবতার ধ্যান অভ্যাস করিলে, ফল আশুপ্রদ হইয়া থাকে।

ধারণা।

ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে স্থিরভাবে ধরাকে ধারণা বলে। যত সোপান উপরে উঠিবে, কার্য্য সকল তত সহজ হইয়া পড়িবে। নিয়ম সংযমাদি প্রতিপালন করিয়া কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ধারণা অতি সহজে লাভ হয়। ধারণায় নূতন চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তখন সত্য-মিথ্যা, কার্য্য-অকার্য্য সকল অন্তচক্ষু দ্বারা দৃষ্টি গোচর হইবে। তৎপর, হিতাহিত গন্তব্য পথ, আর বলিয়া দিতে হইবে না।

প্রত্যাহার।

ধারণায় পরিপক্ক হইলে, তীব্র-বৈরাগ্য সাহায্যে মনকে বাহিরের সমস্ত বিষয় হইতে টানিয়া লইয়া, স্বীয় ইষ্টাভিমুখে কেন্দ্রীভূত করাকে প্রত্যাহার বলে। এই অবস্থায় ইষ্টদেবতায় দেয় পুষ্প-চন্দনাদি, তাহাকে অর্পণ করিতে গিয়া, নিজ মস্তকে স্থান পাইবে। তখন নিয়ম সংযমাদি গণ্ডি সকল আপনা হইতেই খুলিয়া যাইবে। মৃগ যেমন নিজ নাভিগন্ধে নিজেই মত্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার আত্ম-প্রেমানন্দে তুমিও বিভোর হইয়া যাইবে। তৎপরবর্ত্তী সোপানে, সে আনন্দ স্রোতও রহিত হইয়া যাইবে, তখন থাকিবে কেবল "অবাঙ্মানসগোচরম্।"

কাল-ধৰ্ম্ম।

সৃষ্টি হইতে লয়, ইতি মধ্যস্থিত ভাগকে সময় বা কাল বলে। সাধারণতঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এই তিন অবস্থায় কাল বিভক্ত। ইহাকে আবার চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি কালের চারি প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন; সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে, দান, যজ্ঞ, তপস্যাদি ব্যবস্থিত ছিল; কিন্তু কলিতে কেবল মাত্র "হরের্নামৈব" অর্থাৎ কেবল হরি-নামই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

কালধর্ম্ম অনুসারে মানবের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ব্যবস্থিত আছে; এবং তদনুরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে অতি শীঘ্র সুফল প্রদান করিয়া থাকে। কাল বিপরীত ধর্ম্মে, কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণ অঙ্গে সুসম্পন্ন হয় না; সে কারণ পূর্ণ ফল লাভের আশাও করা যায় না। এতদপূর্ব্বকালে মানবগণ কালানুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন, এবং কাল অনুরূপ দীর্ঘায়ু, শক্তিশালী ও ধনশালী ছিলেন; তখন ধর্ম্ম কর্ম্মও

সেইরূপ সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে মানবগণ অল্পায়ু, হীন-শক্তি এবং দারিদ্র্য পীড়িত। দিবানিশি কেবল শারীরিক বা আর্থিক অথবা উভয় প্রকার চিন্তাতে ব্যাপৃত থাকা যে কালের ধর্ম্ম, সে কালে কষ্ট সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ধর্ম্ম কর্ম্ম, কখন সাধ্যায়ত্ত হইবার নহে। কলিতে সুখে-অসুখে, অর্থে-পরমার্থে, সর্ব্বকার্য্যে সদাসর্ব্বদা একমাত্র ভগবৎ "নাম" গুণগান করাই বর্ত্তমান কালধর্ম্ম। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, কাল ধর্ম্ম অনুযায়ী, কলিতে "নামের" প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় নাম স্মরণ মনন অপেক্ষা, একত্র সমবেত হইয়া, নামসংকীর্ত্তন করা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; কারণ, কলিতে মানবগণের মন, সর্ব্বদা সাংসারিক বিষয়-বিষে গাঢ় আচ্ছন্ন; এমন তমসাচ্ছন্ন মনে সর্ব্বদা ভগবান চিন্তার স্থান হওয়া দুরূহ ব্যাপার; সেই জন্যই প্রথম অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে "নাম সংকীর্ত্তনের" ব্যবস্থা। উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্ত্তন, কলির জীবের পক্ষে যে কি অমৃত তুল্য কর্ম্ম, তাহা কেবল অনুষ্ঠানকারীরই বোধগম্য, অন্যের বুঝিবার নহে। অনেকে নীচ জাতির সহিত একত্র সম্মিলনে, সংকীর্ত্তন করা হেয় বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু

যিনি অন্ততঃ একদিনের জন্যও মন প্রাণ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে একত্র সম্মিলনে নাম সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, সে সময়ে বর্ণ-অবর্ণ, উঁচু-নিচু জাতিভেদাদি-জ্ঞান থাকে না। তখন এক প্রকার মহাশান্তির আভাস হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং সে শান্তভাব কীর্ত্তন পরেও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। তখন মনে হয় যেন সংসার হইতে পৃথক কোন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এইপ্রকার একত্র সম্মিলনে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, মনের মলিনতা দূর হইয়া যায়, তখন দূর হইতে "নাম" কীর্ত্তন শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র, আপনা হইতেই মনে অজানিত আনন্দ উপস্থিত হয়। সে সময়ে প্রকৃত শান্তির বিমল সুখ উপলব্ধি হইয়া থাকে; এবং ছুটিয়া গিয়া ঐ আনন্দে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। যখন "নাম" শ্রবণ মাত্র মনে অহৈতুক হৃদয়বেগ উপস্থিত হইবে, এবং গুণ গুণ স্বরে সর্ব্বদা নাম গান করিতে বড় আয়াস বোধ করিবে, তখন "নাম" স্মরণ-মননে শান্তির শীতল ছায়া অনুভবে আসিবে; নচেৎ, প্রথম অবস্থায় বিষয়াচ্ছন্ন মনে ভগবানের নাম স্মরণ-মননে, নামের মহিমা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। তরুণ-ব্যাধিতে যেমন অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগে

কোন সুফল বুঝিতে পারা যায় না, সেইরূপ গাঢ় বিষয়াসক্ত মনে, প্রথম অবস্থায় স্মরণ-মননে, নাম গুণও তেমন অনুভব হয় না। সেই কারণ প্রথম সোপানে একত্র সম্মিলনে উচ্চৈঃস্বরে "হরিনাম-সংকীর্ত্তন," কলিকালে পরমার্থ পথের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ও অতি শীঘ্র ফলদায়ক। উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন সময়ে, সাংসারিক কোন সংকল্প মনে উদয় হইবার অবকাশ পায় না, সেই জন্য প্রথম অবস্থায় একত্র সম্মিলনে "নাম কীর্ত্তন" অন্তঃশুদ্ধির প্রধান এবং প্রথম সোপান।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে, যোগ, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ কর্ম্মাদি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি লাভ হইত; কিন্তু কলিতে যোগ, তপস্যা, দান, যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও, তাহাতে শুভফলের আশা কম; কারণ, দান-যজ্ঞাদি কাম্য অনুষ্ঠান কালে, এক্ষণে মানবগণ কদাচ সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করিতে পারে না, তাহাতে কর্ম্মফলও শান্তিদায়ক হয় না। সেইজন্য কলিকালে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" চারিবার হরিনাম উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, গত তিন যুগে দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং হরিনাম সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান ব্যবস্থা ছিল,

কিন্তু কলিতে "হরের্নামৈব কেবলম্, নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" ॥ অর্থাৎ কেবল মাত্র হরিনাম ব্যতীত, অন্য কোন প্রকার কর্ম্মে, কলিতে সদ্গতি লাভ হইবে না, ইহা তিন সত্য করিয়া বলিয়াছেন। এই মহান্ বাক্য ধ্রুব সত্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার প্রতিকূলাচরণ করিলে তাহার সকল কর্ম্ম-কাণ্ডই হস্তিস্নানবৎ বৃথা হইবে।

অর্থাদির জন্য ভগবানের স্মরণ-মনন, অতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম। জীবনে অর্থাদি যাহা ভোগ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল মাত্র। ভগবানের নিকট এক মনে অর্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি তোমাকে যথেষ্ট অর্থের অধিকারী করিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাকে আরও অধিক অনর্থে ফেলিয়া দিবে বই, পরমার্থ সুখ-শান্তি পাইতে দিবে না। যাহাতে চির-সুখশান্তি প্রদান করিতে পারে, এমন বস্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করাই শ্রেষ্ঠ। চিরসুখ-শান্তি-দাতার নিকট, ক্ষণিক সুখ-শান্তি প্রার্থনা করা, বিষয়োন্মত্ততার প্রধান লক্ষণ।

বর্ত্তমানে মানবগণের সাধারণতঃ, দিবাভাগ অর্থসংগ্রহে কাটিয়া যায়, সন্ধ্যার পর, সকলেই নানা প্রকারে বিশ্রাম-সুখ

অনুভব করিয়া থাকেন। দিবাভাগে যে প্রকার শাবশ্রান্ত পরিশ্রম হইয়া থাকে, তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে "নাম" কীর্ত্তন করা প্রথমে কষ্টকর সন্দেহ নাই, তবে অনায়াসে মৃদুস্বরে অথবা মনে মনে অনায়াসে নাম গুণ কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। নাম গুণ গানের সময় মনকে সাংসারিক বস্তু হইতে ফিরাইয়া আনিয়া, নামেতে সংযোগ করিতে সাধ্যমত অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাহাতে মনঃসংযোগ হইবে; এবং আপনা হইতেই রুচি আসিবে। স্বভাবতঃ মন সংসারের নানা চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, সে জন্য প্রথম অবস্থায় মৃদুভাবে নাম গানে মনোনিবেশ হয় না। মুখে উচ্চারিত হইলেও, মন বিষয়-ব্যাপারেই লিপ্ত থাকে। নামকারীর যেন ইহা স্থির সঙ্কল্প থাকে যে, "নাম" গুণ গানের সময় মনকে বৈষয়িক বস্তু হইতে ক্রমশঃ নামে যোগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

এই প্রকার সংকল্পে মৃদুস্বরে নাম গান করিলে, অভ্যাস দ্বারা শীঘ্রই নামে মনঃসংযোগ হয়। নামে মনঃসংযোগ হইলে, নামের মহিমা উপলব্ধিতে আসিবে, তখন উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে কষ্ট স্থলে অপার

আনন্দ উপস্থিত হইবে, এবং সাংসারিক সকল পরিশ্রম কোথায় ভাসিয়া গিয়া বিমল শান্তি-সুখানুভব হইতে থাকিবে। স্বভাবতঃ বিষয়াভিমুখী মনের গতিকে যত্ন অভ্যাস দ্বারা ভগবানের নাম অভিমুখী করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহার যতটা মনের গতি বিষয় হইতে নামে সংযোগ হইবে, তাহার ততটা নাম-মহিমা অর্থাৎ ভগবানের নাম করিবা মাত্র, মনে যে কি এক অপার আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহা, উপলব্ধি হইবে, অন্যথা নাম-মহিমা দুজ্ঞেয়। অতি কষ্টে অথবা অতিশয় ভয়ে যখন ভগবানের নাম স্মরণ করা যায়, তখন মনে এক অজানিত-শক্তির সঞ্চার হইয়া, ঐ কষ্ট বা ভয়ের লাঘব করিয়া দেয়; ইহা সাধারণের অনুভবনীয়। ইহার কারণ অতি কষ্টে বা ভয়ে যখন ভগবানকে ডাকা যায়, তখন মন কোন বিষয়-বস্তুতে সংযোগ থাকে না, কেবল মন প্রাণে ভগবানকেই ডাকিতে থাকে। সেই সময়ে যথার্থ ভগবানে মনঃসংযোগ হয়; তাহার ফলও তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারা যায়। জপ, তপ যাহা বল, সকলের মূল ভগবানের নাম; যেই নাম, সেই ভগবান ইহা নিশ্চিত, সাপেক্ষ মাত্র নামের সহিত মনের যোগ হওয়া। ভগবানের মহিমা যেমন অনন্ত,

অসীম, তাঁহার নাম-মহিমাও তেমন অনন্ত অসীম। যতই কলুষিত চিত্ত হউক না কেন, অহঃ-রহঃ কেবল মাত্র নাম গানে অতি শীঘ্র চিত্তের কলুষতা নষ্ট হইয়া, চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে। যিনি যতই বিষয়োন্মত্ত হউন না কেন, ক্ষণমধ্যে দেহসম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, সেই ক্ষণের চিন্তা সর্ব্বদা মানব মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অন্য জীবের সেই ক্ষমতা নাই, মানবের আছে, তাই মানব সকল জীবের শ্রেষ্ঠ, অন্যথা শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না। সমস্ত নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমনান্তর, শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম হইয়াছে; পুনরায় নিকৃষ্ট যোনিতে পতিত হইতে না হয়, দিনে দিনে তদভিমুখে কাল অনুরূপ পথাবলম্বনে অগ্রসর হওয়া, মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

স্বধর্ম্ম।

স্বধর্ম্ম অর্থে আজকাল অনেকে আত্মধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। আত্মধর্ম্ম যে কি সূক্ষ্ম তাহা বোধ হয়, তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। কোন বস্তুতে আত্মার আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা নাই, নিষ্কাম ভাবই আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু স্বধর্ম্মের শব্দগত অর্থ আপন ধর্ম্ম। যে স্থলে "আপন" দ্বারা একটা স্বাতন্ত্র্য ভাব উল্লিখিত হয়, সে স্থলে আত্মার সেই নিষ্কাম ভাব কখন থাকিতে পারে না, সুতরাং স্বধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মে বিস্তর প্রভেদ।

এখন দেখা যাউক, আত্মধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্মের উৎপত্তি কোথা হইতে? জীবাত্মা বাসনাবশে চঞ্চল হইয়া, মন উপাধি ধারণ করিয়া, পৃথিবীর স্থূল বস্তুতে সংযুক্ত হয়। এই মন উপাধি থাকিতে আত্মধর্ম্ম কদাচ লাভ হয় না। যে স্থূল বস্তু সংযোগে মন এই উপাধি ধারণ করিয়াছে, সেই স্থূল-বস্তুর দ্বারাই, সূক্ষ্ম-বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই জন্য পূর্ব্ব মহর্ষিগণ, দান, যজ্ঞ, পূজা ও পরিচর্য্যাদির

ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহার যে কুল-প্রথানুযায়ী পূজা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম, সুতরাং ধর্ম্ম-বস্তু প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হইলেও, আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মপথ সকল সূক্ষ্ম নহে। স্বধর্ম্মের পূর্ণ অনুষ্ঠান হইলে, মনের লয় হইয়া আত্মধর্ম্ম প্রকাশ হয়। সৎকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানাদি করিতে করিতে, বহু জন্মে নিষ্কাম আত্মধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম কদাচ হইতে পারে না।

যাহার যে কুলধর্ম্ম, তাহাকে তাহাতেই নিষ্ঠাবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের ধর্ম্মপথ বহু শাখাযুক্ত। ধর্ম্ম-পথে পদস্খলন হওয়া অবশ্যম্ভাবী; তবে কোন কোন পথে পদস্খলন হইলে, অন্য শাখায় আশ্রয় পাইবার আশা থাকে, আবার কোন পথ এত দুর্গম যে, পদে পদে পদস্খলিত হইবার আশঙ্কা ত আছেই, তৎপর পদস্খলন হইলে, একেবারে অধঃপাতের শেষ সীমায় লইয়া যায়। যাহার যে কুলধর্ম্ম তাহা যেরূপ দুর্গমই হউক না কেন, তাহাই অবলম্বনে অগ্রসর হওয়া বিধেয়; কারণ পুরুষানুক্রমিক দুর্গম পথবাহী বংশধরের, উভয় পদস্খলন কমই ঘটিয়া থাকে। কুলধর্ম্মই তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। কিন্তু যদি অপেক্ষাকৃত

সুগম পথের পথিক, নিজ পথ ছাড়িয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ দুর্গম পথের আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী ঘটিয়া থাকে। তাই ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "নানারূপ উপচারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা, নিজের কুলধর্ম্ম যেরূপেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহাই সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ জানিও। এমন কি স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ মনে করিবে, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিও না।" ভগবানকে মন প্রাণে পূজা অর্চ্চনা দ্বারা সন্তোষ বিধান করাই যখন ধর্ম্ম, তখন তাঁহার নিষেধ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া, কদাচ ধর্ম্মোপার্জ্জন হইতে পারে না। সেই জন্য যাহার যেরূপ কুলধর্ম্ম, তাহার সেই পথে ভগবানের অর্চ্চনা করা ইষ্টপ্রদ হইয়া থাকে, ইহাই ভগবানের শ্রীমুখের আজ্ঞা।

রিপু-বৃত্তি।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য এই ছয় প্রকার রিপুর মধ্যে, কাম রিপুই অন্যান্য রিপুসমূহের উৎপত্তির কারণ; এবং নানারূপ বিষয়-সঙ্গ হেতু কামনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

বিষয়-চিন্তারত পুরুষের বিষয়-সঙ্গহেতু কামনা জন্মে। এবং কামনা প্রতিহত হইয়া, অর্থাৎ কামনাজাত বস্তু লাভে অকৃতকার্য্য হইলে, ক্রোধের বিকাশ হয়। তৎপর ক্রোধ হইতে লোভ মোহাদি জন্মিয়া থাকে।

ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, রিপু-বৃত্তি সকল সংযত করিতে হইলে, অনাদি ভাবের অর্থাৎ নিষ্কামতার আশ্রয় লইতে হয়। নিষ্কামতা অভ্যাসে নানা বিষয় চিন্তা, ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে। চিন্তা বিষয়-বস্তু সকল যত অল্প হইবে, সেই সাথ রিপু-বৃত্তি সমূহও, তৎপরিমাণ

হ্রাস পাইবে। নিস্কামতা অভ্যাস ব্যতীত রিপুবৃত্তি সকল, কখনও সংযত হয় না। চিন্তা বিষয় সকল "আমি" বোধ ত্যাগে, অনুষ্ঠান করাকেই নিস্কামতা বলে। "আমি" বোধ ত্যাগ এক-মাত্র ভগবানে ভক্তি দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যাদি অনুষ্ঠানে, ঐ ত্যাগ বোধের কদাচ আয়ত্ত করা যায় না। নিস্কামতারূপ কঠিন ভাব, একমাত্র ভক্তি রসেই ভিজিয়া থাকে; এবং তাহাতেই, তাহার সুরস উপলব্ধি হয়। ভক্তি-বিহীন শুষ্ক পথিক, ন্যাবা রোগীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবৎ চিন্তা কাষ্ঠ চর্ব্বনের ন্যায়, শুষ্ক বোধ করে।

ভক্তি দ্বারা আপনা হইতেই, ভগবৎ চিন্তাতে নিস্কাম ভাব হইয়া থাকে; এবং ঐ মহাভাব যত অধিক আয়ত্ত হইতে থাকে, রিপু-বৃত্তি সকলও তত নিজায়ত্তাধীনে আইসে।

রিপু-বৃত্তি সকলের কার্য্য বিপরীতে, প্রথমতঃ যখন তাহারা শত্রু তুল্য আচরণ করে, তখন রিপু প্রধান কামনাকে নানারূপ স্তুতি মিনতি দ্বারা, স্বভাবে আনিবার চেষ্টা করিতে হয়। কথায় বলে যে, "যে যেমন ভাবে যাহার ভজনা করে, সে তাহাকে তেমনি ভাবে ভজিয়া থাকে।" মনে কোন সংকল্প স্থির করিয়া, যত্ন অভ্যাস দ্বারা সেই সংকল্প,

কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা নিশ্চয় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

যত্ন চেষ্টা দ্বারা যখন কামনা স্ব-বশে আয়ত্ত হয়, তখন সে মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। কামনার সহিত মিত্রতা জন্মিলে, অন্যান্য রিপু সমূহও তদ্রূপ হয়। সে সময় ভগবৎ চিন্তাতে, কোন কারণে কামনা প্রতিহত হইলে, তাহা হইতে ক্রোধ না জন্মিয়া, অনুরাগে তাহা আরও অধিকতর কার্য্যপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। অর্থাৎ মিত্র যেমন মিত্রের নিকট তাহার কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রত্যাশা করিয়া না পাইলে, সে যেমন ঐ বস্তু মিত্রেরও অভাব বুঝিয়া, অন্য স্থান হইতে সেই দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, নিজের অভাব পূরণ করিয়া লয়, সেইরূপ, কামনার সহিত মিত্রতা স্থাপনেও, ঐ প্রকার সুফল প্রদান করিয়া থাকে। সম নাম বা গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বয়েরই, পরস্পর মিত্রতা হইয়া থাকে। এস্থলে স্ব-কামনার সহিত, বিষয়-কামনার মিত্রতাও ঐ প্রকার। এ সম্বন্ধে গীতাতে শ্রীভগবান এই রূপই বলিয়াছেন—

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ"॥

যিনি আত্মার দ্বারা মন বশীভূত করিয়াছেন, আত্মা সেই

ব্যক্তির আত্মার বন্ধু; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়ের আত্মাই শত্রুতায় শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই রূপ পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইলে, আহার বিহারে সংযমতা, আপনা হইতেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রিপু সকলের উৎপত্তি ও ক্রিয়া না বুঝিয়া, আহার বিহারে সংযমী হইতে চেষ্টা পাইলে, তাহার ফল স্থায়ী হয় না। কারণ আহার বিহারে, কামনা পূর্ব্বমতই ভোগাকাঙ্ক্ষিত থাকে। তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা বলপূর্ব্বক প্রতিহত রাখা হয়। ইহাতে পতন আশঙ্কাই অধিক। স্বাধীনতা ভাবের একটু বিপর্য্যয় ঘটিলেই, অমনি কামনা তাহার প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বসে; এবং পূর্ব্বমত স্বাধীনতা ভাব আয়ত্ত করিতে, বহু আয়াস পাইতে হয়; হয়ত সেইরূপ আয়ত্তাধীনে আর নাও আসিতে পারে। পতনের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া, আহার বিহারাদিতে বিশেষ যত্ন অভ্যাস দ্বারা, সংযমতাতে সুফল প্রদান করিয়া থাকে। রিপু বৃত্তি সকল নিরোধ করা, নিরোধ-বায়ুর ন্যায় অতিশয় কঠিন।

পৃথিবীতে দৃশ্য বা অদৃশ্য, সকল বস্তুই ভগবানের বিভূতি মাত্র। জীবের এমন সাধ্য নাই যে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক আয়ত্তাধীন করে। কর্ত্তার কৃপাতেই কার্য্য সহজ-সাধ্য হয়।

সে কারণ সর্ব্ব কার্য্যে কর্ত্তার স্মরণ লইলে, কার্য্য সমূহ সহজে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভৃত্য, কার্য্যে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে, মনিব বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে যেমন অপেক্ষাকৃত সহজ কর্ম্মে নিযুক্ত করে, তদ্রূপ সর্ব্ব কার্য্যাগ্রে, ভগবানের নিকট দয়া প্রার্থনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, অতি সুকঠিন কার্য্যও সহজসাধ্য হইয়া থাকে; ভগবৎ বাক্যে কর্ত্তা ও কর্ম্ম, উভয়ই "তাঁহার" সত্তা মাত্র। কর্ত্তাকে কার্য্যের বিষয় যত অধিক কায়-মনোবাক্যে জ্ঞাপন করা যায়, কার্য্য সমূহও, তত সহজসাধ্য হইয়া থাকে। অর্থে বা পরমার্থে শত্রু অথবা রিপু জয়ে, যে কর্ম্মেই হউক, সর্ব্ব কার্য্যারম্ভে কার্য্যকর্ত্তার অনুমতি প্রার্থনা বিধেয়।

ভক্ত ও ভগবান।

শ্রীভগবানের স্বরূপ, অব্যক্ত, অসীম, অরূপ ও অচিন্ত্য এবং ব্যক্ত, সসীম বহুরূপ এবং চিন্তায়ত্ত, উভয়তঃ। সাংখ্য দর্শনাদি মতে আত্মজ্ঞানাদি দ্বারা, অব্যক্ত ভাবের উপাসনা করা হয়; এবং পাশুপাত ও পঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে জীব ও ঈশ্বরের সেবা-সেবক ভাব দ্বারা, ব্যক্ত ভাবের সাধনা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এইরূপ পৃথক পৃথক পথ বিদ্যমান আছে, তাহা হইলেও যেমন জল নানা পথে গমন করিয়াও, শেষে এক সমুদ্রতেই স্থান পায়, সেইরূপ লোক সকল সরল, বা কুটীল যে পথেই গমন করুক, শেষে একমাত্র ভগবানেই আশ্রয় লাভ করে। অব্যক্তাদি নিরাকার ভাবের সাধনাতে অধিকতর ক্লেশে সাধক সাধনসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং রূপরসাদি ব্যক্ত ভাবের সাধনাতে সিদ্ধি অতি সুখজনক ও সহজসাধ্য হয়।

ব্যক্তভাবের সাধনাতে, সাধক ভগবানের পূজা অর্চনাদি কার্য্যে, প্রথম অবস্থায় নানারূপ আনন্দ অনুভব করিয়া

থাকে। তৎপর, দ্বিতীয় অবস্থায়, যখন হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রকাশ হইতে সূচনা হয়, তখন তদপেক্ষা অধিকতর স্ফূর্ত্তির স্ফূরণ হইয়া থাকে। এতদপরবর্ত্তী অবস্থায়, ভগবানের সহিত ভক্তের বাসনা অনুযায়ী, নানাবিধ রসের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ অচিন্ত্য অব্যক্তাদি হইলেও, ভক্তের স্থূলভাবের সাধন জন্য, তিনি ভক্তের বাসনা পূরণাভিলাসে, ভক্ত-বাঞ্চানুযায়ী ক্রিয়া করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় ভক্ত, ভগবানের নিকট নানাবিধ সুখ-দুঃখাদি জ্ঞাপন করিয়া থাকে; এবং স্তব-স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে সন্তোষ বিধান করিতে যত্নবান হয়। আবার অবস্থান্তরে, অর্থাৎ যখন ভগবানের অন্তর্ধান হয়, তখন তৎবিয়োগ জনিত সাতিশয় দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে। বিচ্ছেদ-মিলনের ঘাত প্রতিঘাতে, ভক্ত কখন হাস্য, কখন বা ক্রন্দন, আবার কখনও নৃত্যানন্দে বিভোর হইয়া থাকে।

মানুষের মন, অনাদিকাল হইতে সংসার রসে পুষ্টিলাভ করিয়া আসিতেছে। ইহাকে ভিন্নরসে লইতে হইলে, একেবারে বল পূর্ব্বক লওয়া যায় না। যত্ন-অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ ভিন্ন রস আয়ত্ত করিতে হয়; পরে ঐ রসের আধিক্য জন্মিলে, আপনা হইতেই সংসার রস দূরে সরিয়া

যায়। জগতে নিত্য ও অনিত্য এই দুই রসই প্রধান। অনিত্য রসকে সরাইতে হইলে, নিত্য রসের আশ্রয় লইতে হয়। নিত্য রস মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ রস।

ভক্তিরস সম্বন্ধে ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥"

অর্থাৎ—সর্ব্বভূতে আমি সমদর্শী হইলেও, ভক্তির এমনই প্রভাব যে, আমাকে পক্ষপাত করিয়া ফেলে।

আবার বলিয়াছেন—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতিঃ ॥"

অর্থাৎ—হে কৌন্তেয়! আমাকে যে একাগ্রচিত্তে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে, সে অতিশয় দুরাচার হইলেও, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; যে হেতু, সে ব্যক্তি সাধু পথ অনুসরণ করিতেছে। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি, সদাচার বা দুরাচার যেমনই হউন না কেন, তাঁহার বিনাশ নাই, তিনি অবশ্য কল্যাণ

লাভ করিবেন; তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। এই পরম বস্তুর গৌরব রক্ষার্থ আবও বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না এবং যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নামগুণ গান করে, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি। ভক্তির অপার গুণ ও মহিমা আছে বলিয়াই,

পরম ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন:—

"যোনী যোনী সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজামাহং।
তেষু তেষবচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

হে প্রভো! আমি যে যে যোনীতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন সেই সেই জন্মেতে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। ভগবান ভক্তবৎসল বলিয়াই, তাঁহার ভক্তের এত সমাদর। তিনি যদি ভৃগুমুনির পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ না করিতেন, এবং পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পদ ধৌত না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কেহ ভক্তের অপার মহিমা জানিতে পারিত না। ভক্তি শাস্ত্রের রূপক দ্বারায় এরূপ বর্ণনা করা আছে যে, জ্ঞান,

পুরুষ, এবং ভক্তি, কোমল প্রকৃতি স্ত্রীজাতির ন্যায়। জ্ঞান-রূপী পুরুষ কেবল ভগবানের বাহিরের সংবাদ রাখে, কিন্তু ভক্তিরূপিণী স্ত্রীগণ, তাঁহার অন্তপুরের সংবাদ রাখিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জ্ঞানাভিমানী পুরুষগণ, কেবল বেদ বিধি নিষেধ বাক্যে বিমোহিত হইয়া থাকেন, ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। কিন্তু ভক্ত, ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও আত্ম সমর্পণ দ্বারা ভুক্তি মুক্তি তাচ্ছিল্য করিয়া, ভক্তি-সুধারস পান করিয়া থাকেন। ভক্তকে সালোক্য, সাযুয্য, সামীপ্য ও সারূপ্য এই চতুর্বিধ মুক্তি দিলেও, সে তাহা তুচ্ছ করিয়া ভগবৎ সেবাই সতত প্রার্থনা করিয়া থাকে।

এই ভাবে বিভোর হইয়াই ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে বল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, (মন) চিনি খেতে ভালবাসি ॥"

এই ভক্তি গুণেই বশীভূত হইয়া, ভগবান বলিরাজের দ্বারিত্ব, পাণ্ডবদিগের দৌত্য ও সারথ্য স্বীকার করিয়া-

ছিলেন। সংসার বিষয়-বিষে সন্তপ্ত মানবের, পরম শান্তি লাভ করিবার, ভক্তি-সাধনাই প্রশস্ত পথ।

ভাবগ্রাহী ভগবানকে, ভক্ত যে ভাবে ভাবনা করে, তিনিও ভক্তের ভাবানুযায়ী রূপবসে, তাহার বাসনা পূরণ করিয়া থাকেন।

ভগবান নিত্যানন্দময়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তৎভক্তই নিত্যানন্দের আনন্দ আস্বাদ, তাহাকে প্রদান করিতে সক্ষম হয়। ভগবানের সৃষ্ট-জগতে নানারূপ উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু থাকিলেও, তিনি তাহা কদাচ ভোগ করেন না, বা করিতে ইচ্ছাও করেন না। কেবল মাত্র তৎভক্তই, সৃষ্ট বস্তু মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করে, সেই দ্রব্য সকল, ভগবানকে উপভোগ করাইতে সক্ষম হয়। ভগবান যেমন সর্ব্বদা জগতকে নানা উপচারে লালন পালন করিতেছেন, তেমন তৎভক্তও, তাঁহাকে নানা উপচারে সেইমত সেবা সুশ্রূষা করিতে পারগ হয়। ভক্তগণ তাঁহাকে যে দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়া থাকে, এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সেই ভক্ত-দত্ত দ্রব্যমাত্র তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। জীবের কিসে সুখশান্তি হইবে, তৎবিধানে তিনি সতত বিব্রত থাকেন। তাঁহার নিজের কোনও চিন্তা তিনি

করেন না। এমন দয়াল প্রভুকে আয়াস দিতে যে জীব সতত চেষ্টান্বিত হয়, ধন্য তাহার জীব-আখ্যা, ধন্য তাহার দেহ-ধারণ। সে জীব হইয়াও জীব-কর্ত্তার আহার দাতা ও পালন কর্ত্তা, কর্ত্তারও কর্ত্তা।

এতদপরবর্ত্তী অবস্থায় ভক্ত অজানিত ভাবে ভগবানের সারূপ্য লাভ করে। তখন ঐ ঘাত-প্রতিঘাতও রহিত হইয়া যায়। সে অবস্থা, বাক্য, মন ও ভাষার অতীত। তাহাই ভগবানের স্বরূপ। এই মহা ভাবাবস্থা কল্পনা করিয়া আত্ম-জ্ঞানাদি ও ব্রহ্মোপাসনাদি দ্বারা সাধন কার্য্য হইয়া থাকে। কল্পনা সাহায্যে ঐ মহাভাবাবস্থা কদাচ আয়ত্তাধীন হয় না। যাহা কল্পনা অতীত, তাহা কখনও ধারণা করা যাইতে পারে না; এবং ধারণা ব্যতীত, সমাধি লাভও হয় না। তবে সত্যের অনুসন্ধান কখনও মিথ্যা হয় না; তাহাতেই "অব্যক্ত ভাবের সাধনা, অতিকষ্টে ও বহু জন্মে সিদ্ধি হইয়া থাকে।" ইহা ভগবানের শ্রীমুখের বাণী।

সাধক যখন নিজে স্ব-প্রকাশে আছেন, তখন অপ্রকাশের তত্ত্ব না করিয়া, স্ব-ভাবে স্বভাবের খেলায় যোগ দিলে, সিদ্ধি অতি সহজ লব্ধ হয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, জীবের স্বভাব কি? জীবের চিত্তে সর্ব্বদা অন্য, কোন না

কোনও চিন্তা বস্তু অবলম্বিত থাকে, চিন্তা অবলম্বন ব্যতীত, জীব থাকিতে পারে না; পৃথিবীর রূপ-রসাস্বাদ জন্য অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষিত থাকে। ইহাই জীবের স্বভাব গতি। এই স্বভাবে, স্ব-ভাব মিশাইয়া, অর্থাৎ পার্থিব অনিত্য রসের পথ দিয়া নিত্যানন্দ ধামে গমনের, সেব্য-সেবক ভাবের ষড়রসের সাধনা, অতি সহজসাধ্য ও আনন্দপ্রদ।

ভক্তিপ্রার্থী মহাজনগণের যে চিন্তা দ্বারা ভক্তির উদয় হয়; সেই চিন্তাকে প্রথমাবস্থায় চিত্তের অবলম্বন করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। পিতামাতার শ্রদ্ধা, ভক্তির প্রথম সোপান। পত্র মধ্যে তুলসী ও বিল্বপত্রাদিতে এবং পশু মধ্যে গবাদির গুণের উপকারিতা হেতু, প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহাদের যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকি, আমাদের মাতৃস্নেহ গলিত ক্ষীরধারের এক ধারায়, ঐ সকল গুণের যে কত সহস্রাংশ অধিক গুণ বিদ্যমান আছে, তাহা একবার চিন্তাদ্বারা উপলব্ধি করিবার আবশ্যক। তুলসী বা বিল্ব-পত্রাদি ও গবাদিকে, যে পরিমাণ সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকি, তদপেক্ষা কত সহস্রগুণ অধিক, পিতামাতার সম্বর্দ্ধনা করা কর্ত্তব্য, তাহাও বুঝিবার আবশ্যক। অগ্রে গুরুজনাদির

প্রতি সরল প্রাণে সম্বর্দ্ধনা দ্বারা তৎপ্রতি নিষ্ঠা জন্মিলে, পরে অন্যান্য সকল বস্তুতে, স্বতঃই নিষ্ঠা আসিয়া থাকে। গৃহে পিতামাতাদি গুরুজনের প্রতি নিষ্ঠাবান না হইয়া, বাহ্যিক বস্তুতে নিষ্ঠা স্থাপন করিতে গেলে, মূলবিহীন বৃক্ষেতে জল সিঞ্চন তুল্য, সকল বৃথা হয়।

যাহার মনে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তাহার পক্ষে ভগবদ্ভক্তি অতি সহজ আয়ত্ত হয়। আবার শ্রদ্ধা, ভক্তির দ্বার স্বরূপ। আগে শ্রদ্ধা না জন্মিলে, কখনও ভক্তির আলোক দর্শন হয় না। কোন প্রিয় বস্তু দর্শনে যে আনন্দ উদয় হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলে। এবং তদবস্তু স্মরণ ও মনে উদয় মাত্র, যে আনন্দ স্রোতে হৃদয় ভরিয়া যায়, তাহাই ভক্তি। ত্রিসন্ধ্যা পিতামাতার পাদ বন্দন, পাদোদক গ্রহণ, সর্ব্বদা আজ্ঞা প্রতিপালন ও সেবা শুশ্রূষাদি কার্য্যে শ্রদ্ধার বিকাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মনে মনে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলেই যথেষ্ট। এই সংস্কার সম্পূর্ণ তামসিকতায় পূর্ণ; কারণ স্থির সঙ্কল্প ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধি হয় না। সংকল্পানুযায়ী হস্ত পদাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দ্বারা, চিত্তে সেই সঙ্কল্প স্থির হয়। স্থির সংকল্প লাভে, সংকল্প জাত ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। নচেৎ,

বহু চিন্তা যুক্ত মনের, কার্য্য ব্যতীত, এক চিন্তা স্থির হইতে পারে না। এই জন্য কার্য্য একান্ত আবশ্যক।

এইরূপে সহজ ক্রমে শ্রদ্ধার উন্মেষ হয়। তৎপর আপনা হইতে ঐ শ্রদ্ধা বিকাশ হইয়া, ভক্তিতে পরিণত হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তি, ইহারা ভগবানের দ্বারিস্বরূপ। যিনি শ্রদ্ধা-ভক্তির অধিকারে গিয়াছেন, তাঁহাকে যে শীঘ্রই ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা ধ্রুব সত্য। যমদ্বারে নীত হইবার সময়ে, তাঁর নামের ধ্বনিতে মুক্তি আছে, কিন্তু ভগবৎ দ্বারে সে আশা নাই; কারণ সেথায় মুক্তির মুক্তত্ব লোপ হইয়া, দাসত্বে খাটিতে হয়।

ভক্তি জ্ঞানের চক্ষু স্বরূপ। ভক্তিহীন-জ্ঞান অন্ধ। ভক্তিবিহীন আত্মতত্ত্বে চিত্তের উদ্‌ভ্রান্ততা উপস্থিত করিয়া, পরিণামে উন্মত্ততায় পরিণত করে। কারণ, অচিন্ত্য বস্তুকে চিন্তা দ্বারা আয়ত্তাধীন করিতে হইলে, পূর্ব্বে তাঁহার কৃপার পাত্র হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ যে কার্য্য করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁহার কৃপা হইলে, অনায়ত্ত ও আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে, ইহা সাধারণেরই বোধগম্য।

পিতামাতা ও গুরুজনগণ, শ্রদ্ধার দ্বার তুল্য। বিশেষ

পিতামাতা, ভগবানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং লয় অন্তে ভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া থাকে, সেইরূপ জীব সমুদয়ও, জন্মের পূর্ব্বে এবং মৃত্যুর পরে, মাতৃ-অঙ্কে আশ্রয় লইয়া থাকে। মহাপ্রকৃতিতে যে গুণ সমুদয় বর্ত্তমান আছে, স্ত্রী মাত্রেই সেই গুণ সকল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায়; এবং মহাপুরুষের যে নির্লিপ্ততা ভাব আছে, পুরুষ মাত্রেরই ঐ ভাব স্বাভাবিক। মহাপুরুষ, প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া, জগৎ ক্রিয়ায় রত হইয়াছেন; এবং জীব মাত্রেই স্ত্রী-সঙ্গ হেতু, সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। মহাপুরুষ, প্রকৃতি সংযুক্ত হইলেও, নির্লিপ্ততা হেতু, প্রকৃতি জাত সত্ত্বাদিগুণ সকল, কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীব সকল (আমি আমার ইত্যাকার বোধে) লিপ্ততা হেতু, নানারূপ যন্ত্রণায় পতিত হয়।

মহাপুরুষ-প্রকৃতির সহিত, জীবের পুরুষ-স্ত্রীর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আবার কেবল মাত্র মহাপ্রকৃতির সহিত, স্ত্রীদিগের বিন্দু মাত্রও প্রভেদ নাই। মহা-প্রকৃতিতে যে সকল গুণ বর্ত্তমান আছে, প্রত্যেক গুণ প্রত্যক্ষ ভাবে যাবৎ স্ত্রী-জীবে বিদ্যমান দেখা যায়। পুরুষের স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা (আমি আমার ইত্যাকার বোধে) লিপ্ত স্ত্রী-সঙ্গ

হেতু, সুখ দুঃখাদির উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পুরুষের যত অধিক স্ত্রী-সঙ্গ দ্বারা পুত্র পরিজনাদির সঙ্গ ঘটিয়া থাকে, তিনি ততোধিক সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত জনিত যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন।

গৃহাশ্রমে গুণ সমূহের ক্রিয়া, নিয়মিত বিধিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দীর্ঘায়ু ও সুখ-শান্তি লাভ হয়; এবং গুণ সকলের অনিয়মিত সেবা দ্বারা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি নানা প্রকার অশান্তি আনয়ন করে। ভক্তি-আকাঙ্ক্ষীর প্রকৃতি গুণসঙ্গ সকল যত্ন অভ্যাস দ্বারা, নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করিয়া পিতামাতার সেবা শুশ্রূষাদিতে মন নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। গুণ সকল নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ না করিলে, মনের সুসংকল্পকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া, চিত্ত ভ্রম ঘটাইয়া দেয়। নিয়মিত কার্য্যে, অতি শীঘ্র সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

ভক্তি-বীজ, গৃহাশ্রম হইতে অনায়াসে আয়ত্তাধীন হয়। অন্যান্য আশ্রম সমূহে, ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাতে নিয়মিত ক্রিয়ার দ্বারা শ্রদ্ধার বিকাশ হইলে, পরে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় কোন মূর্ত্তি চিত্তে স্থির রাখিয়া, তাহাকে সেবা শুশ্রূষাদিদ্বারা শ্রদ্ধা আনয়ন করা বড় সহজ নহে। গৃহাশ্রমে পিতামাতাদি গুরুজনগণের সেবা

শুশ্রূষাদিতে, তাঁহাদের কৃপা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইতে আরও অধিক যত্নবান করায়। কোন কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিলে, তাহাতে যেমন সেই কার্য্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা উত্তরোত্তর বলবতী হইতে থাকে, অপ্রত্যক্ষ ফলে তেমন হয় না। এই কারণে গৃহাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গুরুজনাদির সেবা কার্য্যে শ্রদ্ধার উদয় হইলে, পরে কার্য্যদ্বারা তাহা ক্রমশঃ অধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, পৃথিবীস্থ সর্ব্ব জীবে ঐ শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তি দ্বারে উপস্থিত হইতে হইলে, পূর্ব্বে শ্রদ্ধার শরণ লইতে হয়; এবং শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইলে, পিতামাতা ও গুরুজনাদির কৃপা একান্ত আবশ্যক। পিতামাতা বা গুরুজনাদি কাহারও প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা থাকিলে, তাহার কোন কালে শ্রদ্ধালাভ ঘটে না। যেমন বিন্দুমাত্র গোমূত্রে সমুদয় দুগ্ধ নষ্ট পায়, সেইরূপ, অশ্রদ্ধার বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে স্থান পাইলে, তথায় শ্রদ্ধার কদাচ স্থান হয় না। সেই জন্য ভক্তি-প্রার্থীর, অগ্রে পিতামাতা ও গুরুজনবর্গের কৃপা লাভ আবশ্যক। তাঁহাদের কৃপা হইলে, ভক্তি অতি সহজলব্ধ হইবে। ভক্তি-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে ভগবৎ দর্শন লাভ অতি শীঘ্র হইয়া থাকে।

শিক্ষা।

শিক্ষা মানব-জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। যেমন কোন গাছকে বাঁকাইতে হইলে, তাহাকে চারা অবস্থায় ক্রমশঃ নোয়াইতে হয়, নচেৎ কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ, বিষয়াসক্ত মানব প্রকৃতিকে, সুপথে আনিতে হইলে, কোমল অবস্থায় কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; সে নিমিত্ত শিশুকাল হইতে সন্তানগণকে কর্ত্তব্য পথে চালনা করা বিধেয়। শিশুকালে চিত্ত-বৃত্তি সকল, অতি কোমল অবস্থায় থাকে, তখন যেমন ইচ্ছা তাহাকে তেমন ভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিশু অন্তঃকরণ দেব-তুল্য, পরে পশু ব্যবহার শিক্ষা পাইয়া, পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশুত্ব প্রাপ্তির, পিতামাতাই মূল কারণ। শৈশবাবস্থায় সন্তানগণকে কর্ত্তব্য পথে চালনা করিলে সন্তানগণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইত এবং পিতা মাতাগণও তদ্বারা সুখ-শান্তি ভোগ করিতেন। তাঁহারা যেমন সংসারে নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করিয়া, তদীয় পিতা মাতাকে

কষ্ট দিয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাব আবার তৎসন্তানগণে প্রতিফলিত হইয়া, সেইরূপ তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে। এই প্রকার প্রায় সকল পরিবার মধ্যেই আজ কাল পিতামাতাকে যন্ত্রণা পাইতে দেখা যায়। ইহার মূল কারণ, পিতামাতাগণ শিক্ষা-হারা হইয়াছেন। বর্ত্তমানে যেরূপ শিক্ষা পদ্ধতি হইয়াছে, তাহাতে শান্তি-সুখ বিধান করিতে পারে না। যাহাতে লালসাবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, এমন বস্তুতে কদাচ সুখশান্তি দিতে পারে না। ক্রোড়পতি হইলেও, তাহার লালসা-বৃত্তি আরও বর্দ্ধিত হইবে বই, কমিবে না। সংযত লালসাতে প্রকৃত সুখ আছে।

সন্তানগণকে শিশুকাল হইতে আহার বিহারে সংযমতা শিক্ষা অভ্যাস করান, পিতামাতার প্রথম কর্ত্তব্য। তৎপর জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে মানবজীবনকে কর্ত্তব্য পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করিতে হইবে। পূর্ব্বে পিতামাতার জানা আবশ্যক যে, মানবজীবনের কর্ত্তব্য কি? চৌরাশি-লক্ষ যোনী কেবল আহার বিহারের চিন্তাতেই কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু মানবজীবনে আর একটী নূতন চিন্তা যোগ হইয়াছে, তাহা "ঈশ্বর চিন্তা।" ঈশ্বর অনুসন্ধান করা মানবজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্য পথের সোপান, অগ্রে পিতামাতার শিক্ষা করা

আবশ্যক। তৎপর সন্তানগণকে ঐ পথে চালনা করিলে, সংসার প্রকৃত সুখশান্তির আগার হইবে। সত্য-অসত্য, কর্ম্ম-অকর্ম্ম পূর্ব্বে শিক্ষা করিয়া পরে ধন উপার্জ্জন এবং দারপরিগ্রহণাদি করিলে, সে জীবন বড় সুখশান্তিতে অতিবাহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কর্ম্ম-অকর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। মানবজীবন কর্ম্মময়। শিক্ষা দ্বারা প্রকৃত কর্ম্ম জানিতে পারিলে, কর্ম্ম সকল তাহার পিতামাতার, আত্মীয় স্বজন, এমন কি পৃথিবীস্থ সকলেরই আনন্দদায়ক হয়। পূর্ব্বকালে মনিষীগণ প্রথমাবস্থায়, গুরুগৃহে জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান, শিক্ষা দ্বারা লাভ করিয়া, পরে সদাচারে অর্থ উপার্জ্জন ও দারগ্রহণান্তর, মধ্য অবস্থায় সুখ-শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, পরিণামে বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক মোক্ষপথে অগ্রসর হইতেন। এই শিক্ষা পদ্ধতি ব্যতীত, অন্য কোন শিক্ষা পদ্ধতিতে, সংসার কখন শান্তিসুখের আলয় হয় না; এবং এই শিক্ষাই, মানবের প্রকৃত শিক্ষা।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে, পৃথক কোন ব্যবস্থার আবশ্যক নাই; কারণ স্বামীধর্ম্মই স্ত্রীলোকের সারধর্ম্ম। শাস্ত্র এইজন্য অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, "পতিরেক গুরু-স্ত্রীণাং"। স্বামী যে প্রকৃতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে,

তাহার স্ত্রীও, সেই প্রকৃতির অনুসরণ করিবে। পুরুষের সম্পূর্ণ প্রকৃতি তাহার স্ত্রীর প্রকৃতিতে প্রতিফলিত করিয়া, তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য পথের সহকারিণী করা হয়; তজ্জন্য স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী। বালিকা কালে হৃদয়, দর্পণ সদৃশ স্বচ্ছ থাকে। যে ভাব সর্ব্বদা দেখিতে থাকে, সেই ভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া যায়; এইজন্য অধিক বয়সে হৃদয়-দর্পণে অন্য প্রকৃতি উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয় না; সেই নিমিত্ত শাস্ত্রে, অষ্টম হইতে একাদশ বৎসর মধ্যে কন্যাদানের ব্যবস্থা আছে।

আচার।

সাধারণতঃ আচার দ্বিবিধ। সু-আচার ও কু-আচার। সুআচারে মনের পবিত্রতা জন্মে; এবং কু-আচার দ্বারা ঐ ভাব নষ্ট হইয়া থাকে। মানব মাত্রেরই, সু-আচার দ্বারা মনের পবিত্রতা লাভ করা কর্ত্তব্য। বাহ্যিক আচার বিচার দ্বারা দেহের পবিত্রতা হইয়া থাকে; এবং মন দেহ-বুদ্ধি সম্পন্ন থাকায়, দেহের পবিত্রতার সহিত, মনেরও পবিত্র ভাব আইসে। যতদিন মন দেহ-বুদ্ধিযুক্ত থাকে, অর্থাৎ দেহের সুখ-দুঃখ আপনার বোধ করে, ততদিন আচার বিচার প্রতিপালন না করিলে, কু-আচরণ হেতু, মানবের ক্রমশঃ দৈহিক অবনতির সহিত, মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে।

স্নানাদিতে দৈহিক পবিত্রতার সহিত মনেরও পবিত্রতা জন্মিয়া থাকে। তড়াগাদি হইতে স্রোতঃ সলিলে পবিত্রতা অধিক, এবং স্রোত বারি মধ্যে, গঙ্গাজল অধিকতর পবিত্র। যে জলে স্নিগ্ধতাগুণ যত অধিক, তাহাতে দেহের অস্বাভাবিক উত্তেজনা নষ্ট করিয়া, চিত্তের সাম্য ভাব তত শীঘ্র জন্মাইয়া

দেয়। গঙ্গাজলে ঐ স্নিগ্ধতা গুণের আধিক্য বশতঃ অতি শীঘ্র দৈহিক অস্বাভাবিক উত্তেজনা নষ্ট পাইয়া, মনের পবিত্রতা আনয়ন করে। নানা প্রকার, ক্রিয়া-কাণ্ড দ্বারা মনের যে সমতা না হইয়া থাকে, নিয়মিত গঙ্গাস্নান দ্বারা, তাহা লাভ করা যাইতে পারে। তিথি বিশেষে ঐ গুণের আধিক্য হয় জন্য, শাস্ত্রে নানা প্রকার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বিশ্লেষণ, কোন অংশে অসত্য নহে। নিয়মিত গঙ্গাস্নানে শুভফল সকল অবশ্যম্ভাবী।

বায়ুর উগ্রতা যেরূপ বারি বর্ষণে উপশমিত হইয়া থাকে, সেই রূপ বাসনা-বায়ু-তাড়িত মনও, স্নিগ্ধ রসে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। স্নিগ্ধ রস ব্যতীত, চিত্তের সমতা হয় না; এবং চিত্ত স্থির ভিন্নও শান্তি-সুখ অনুভবে আইসে না। তজ্জন্য খাদ্য দ্রব্য মধ্যে স্নিগ্ধ রসযুক্ত ঘৃত দুগ্ধাদির বিশেষ উপকারিতার উল্লেখ আছে; এবং বাহ্যিক ব্যবহারে, স্নানাদিতেও ঐ প্রকারের উপকার জন্মে। মধ্যাহ্ন স্নানাপেক্ষা প্রাতঃস্নানে স্নিগ্ধতা অধিক থাকায়, চিত্তস্থিরতার ক্রিয়া অধিক হইয়া থাকে। সেই কারণ প্রাতঃস্নানে অধিক ফল কথিত হয়। স্নানাদি আচরণ, শারীরিক ও মানসিক উভয় পক্ষেই সমান উপকারী। তৎপর শৌচাদির দ্বারা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে। যে সকল কার্য্যে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ হয়, এরূপ কার্য্য করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অনেকে অল্পবুদ্ধি দোষে, অনাচারকে আচার বোধ করিয়া, অহিতের কারণ উপস্থিত করিয়া থাকে। বিচার পূর্ব্বক আচরণ করা বিধেয়।

ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের সহিত, এবং গুরুজনাদি পূজনীয়-গণের সহিত, একাসনে উপবেশন করা অকর্ত্তব্য; এবং হীন বর্ণের দানাদি গ্রহণ, এমন কি ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ, ব্রাহ্মণ-গণের নিষিদ্ধ আছে। এ সকল আচার বিচার যে বাতুলের উক্তি এরূপ মনে হয় না। কারণ যে আর্য্যজাতির সাংখ্য দর্শন পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিতেছে, তাহাদের লিখিত বিষয়ের অক্ষর মাত্রও যে বৃথা নহে, ইহা ধ্রুব সত্য।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের, অর্থাৎ মানবের প্রবৃত্তি চতুষ্টয়ের সহিত, বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে, ব্রাহ্মণগণের মোক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, ক্ষত্রিয়দিগের অর্থ অর্থাৎ ন্যায় অন্যায় বিচার পূর্ব্বক প্রজা-পালন ও যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া, বৈশ্যের কামনা অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্রের ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে সেবা ভক্তি করা স্বভাবজ

ছিল। সৃষ্টি ক্রিয়া বর্দ্ধনাভিলাষে, ভগবৎ শক্তি ক্রমনিম্নগামী চারিভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রবৃত্তি চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

কালের ক্রমধ্বংসাভিমুখী গতির সহিত, ক্রমনিম্নগামী শক্তিচতুষ্টয়েরও সমতা হইয়া আসিতেছে। সেই কারণ বর্ত্তমানকালে আচার বিচার, প্রায়ই একপ্রকার দেখা যায়। সমশক্তিতে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তজ্জন্যই "তাঁহার" এই সৃষ্টি কৌশল। ইহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই জানেন যে, হীন-শক্তিকে তদপেক্ষা বলবান শক্তি আকর্ষণ করে। তাহা হইলে এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণগণ বা গুরুজনাদির সহিত একাসনে উপবেশন করাতে, শারীরিক সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়। তদপর, ব্রাহ্মণগণের হীন বর্ণের দানাদি গ্রহণ বা ছায়া পর্য্যন্তও স্পর্শ করা নিষিদ্ধের কারণ। একের পীড়া অন্যকে সংক্রামণ করিতে পারে জন্য, সে যেমন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে, সেইরূপ হীন প্রকৃতির আকর্ষণে, উচ্চ বৃত্তি সমূহের হীনতা জন্মিবার আশঙ্কায়, ঐ সকল সতর্কতার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জগতের যাবতীয় পদার্থ, সকল জীবই স্বভাবতঃ ভাল-মন্দ হিত-অহিত বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। যে বিচার বিষয়ে, যত অধিক চিন্তা করিয়া থাকে, সে ততোধিক ঐ

সকলের গুণাগুণ বুঝিতে পারে। বিচার পূর্ব্বক গুণশালী বস্তু সকল গ্রহণে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখের কারণ হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধ ও গুরুজনাদি যে প্রকার উপদেশ দেন, তাহাই স্থির বিশ্বাস করিয়া পালন করিলে, পরে তদবয়সপ্রাপ্তে, তাহার মর্ম্ম সকল উপলব্ধি হয়; এবং জ্ঞানোন্নতির সহিত, নানা প্রকার নূতন বিষয়েরও মর্ম্মোদ্ঘাটিত হইয়া থাকে।

তিথি-পর্য্যায়।
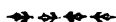
তিথি পর্ব্বের পূর্ব্বে ইহা বুঝিবার আবশ্যক যে, তিথি সকল, যে চন্দ্র সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল গ্রহদিগের তিথি বিশেষে কিরূপ অবস্থান্তর হইয়া থাকে, এবং জীব-দেহ সমূহের সহিত ঐ প্রধান গ্রহদ্বয়ের সম্বন্ধই বা কি আছে?

প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, ইতি মধ্যস্থিত কয়েক দিনকে সংখ্যা অনুসারে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি নাম, লিখিত হইয়া থাকে। তিথি বিশেষে চন্দ্র গ্রহের রূপান্তর অধিক ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে দিনে দিনে চন্দ্রের পূর্ণত্ব হ্রাস পাইয়া, অমাবস্যাতে একেবারে অদর্শন হইয়া যায় এবং তৎপর দিবস, শুক্ল-প্রতিপদ হইতে পুনরায় বিকাশ আরম্ভ হইয়া, পরদিবস দ্বিতীয়াতে দর্শন পথে আইসে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া, পূর্ণিমাতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাই তিথি পর্য্যায়ে, চন্দ্র গ্রহের স্বাভাবিক অবস্থান্তর; তদপর গ্রহণ, দ্বিতীয় অবস্থান্তর। ইহা চন্দ্র

সূর্য্য উভয়তেই সমভাবে দর্শন হইয়া থাকে। এই সকল বিপর্য্যয় কি কারণে ঘটিয়া থাকে, তাহা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষরূপে বিবৃত আছে।

অতঃপর জীবদেহের সহিত গ্রহদ্বয়ের কি সামঞ্জস্য আছে, তাহাই দেখা যাউক। জগতস্থিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় জীবদেহে, ইড়া-পিঙ্গলা নামে চন্দ্র নাড়ী ও সূর্য্য নাড়ী বিদ্যমান আছে। ইড়া নাড়ীতে চন্দ্রের ক্রিয়া এবং পিঙ্গলাতে সূর্য্যের ক্রিয়া, যথাযথরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্যে, তিথি পর্য্যায়ে ও গ্রহণাদিতে যে সমুদয় বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, জীব শরীরও ঐ সময়ে, ঠিক ঐ প্রকারই বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র নাড়ীতে শরীরস্থ রস সমুদয় চালিত হইয়া থাকে; এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতে তেজ প্রবাহিত হয়। আহার বিহারাদিতে অনিয়মজনিত তেজ, হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া রসাধিক্য জন্য, নানারূপ পীড়া জন্মিয়া থাকে। নিয়ম পূর্ব্বক আহারাদি করিলে, শরীরস্থ গুণ সকলের ক্রিয়া সামঞ্জস্য থাকায়, নীরোগী হইতে পারা যায়। এই কারণে আমাদের অমাবস্যাদি তিথি পালন, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

একণে দেখা আবশ্যক যে, ঐ গ্রহদ্বয়ের কাহার কোন্

গুণ প্রধান, ও সেই গুণ সকলের কোন্ তিথিতে কিরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃ চন্দ্র-মণ্ডল, সর্ব্ব রসের আকর স্বরূপ; এবং রস প্রদানে জগতস্থিত প্রাণী সকলকে সঞ্জীবিত রাখে। সূর্য্য, সর্ব্ব তেজের আকর স্বরূপ। জীব সকলকে তেজদানে, চন্দ্রস্থিত রসাধিক্যে, জীবের কোন অনিষ্ট না হয়, তাহা হইতে সতত রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার রস ও তেজের পরস্পর ক্রিয়া সামঞ্জস্যে, জীব সকল জীবিত থাকে। যদি গ্রহদ্বয়ের মধ্যে, কোন গ্রহের কোন অংশে, ক্রিয়ার আধিক্য বা হ্রাস হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর তদংশে নানাপ্রকার পীড়াদি ও মহামারী উপস্থিত হয়। জল-বায়ু দূষিত হইয়া, পীড়াদির উৎপত্তির হেতু হইলেও, দূষিত, জলবায়ু উৎপন্ন হইবার মূল কারণ, তদংশে গ্রহের ক্রিয়া বিপর্য্যয়। গ্রহ সকলের ক্রিয়া স্বাভাবিকে, দূষিত বস্তুও সংশোধিত হইয়া যায়। সে কারণ মানব শরীরের বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ রোগাদিতে গ্রহাদি শান্তি এবং গ্রামস্থ মহামারী ও পীড়াদি শান্তি নিমিত্ত, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত আছে। যে সকল গ্রহ যে কারণে বিপর্য্যয় হয়, তাহা জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে; এবং কোন্ কোন্

দ্রব্য সংযোগ ক্রিয়া দ্বারা, তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে, তাহাও বিশদভাবে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সমুদয় কার্য্য দ্বারা গ্রহদোষ সকল নির্দ্দোষ না হইলেও, কতক পরিমাণে যে উপশমিত হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়। কার্য্য ও দ্রব্য গুণাদির ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহাও জানা আবশ্যক যে, কোন গ্রহের অংশ বিশেষে ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য ঘটিলে, তাহা পৃথিবীর সকল অংশে পতিত হয় না। যেমন কলিকাতায় গ্রহণ হইলে, অনেক সময় বম্বে বা মান্দ্রাজ অঞ্চলে তাহা অদৃশ্য থাকে, ইহাও সেইরূপ।

তিথি বিশেষে যেমন চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, জীব-শরীরেও, সেই সকল তিথিতে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায়, শরীরস্থ রসের সেইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। পূর্ণিমাতে যেমন রসের পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, অমাবস্যাতে আবার তেমন রসের ক্ষয় পাইয়া থাকে। এইরূপ চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় বলিয়াই, জীব সকল সুস্থ শরীরে জীবিত থাকে। নচেৎ একাধিক্রমে পূর্ণিমা লাগিয়া থাকিলে, হয়ত জীব সকল পচিয়া মরিত। মানব সকল জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা, জগতের ক্রিয়ার ঐ সকল গুণাগুণের সহিত দেহের গুণাগুণ বুঝিয়া, অগুণ

হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য, তিথি পালনাদির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গ্রহণকালিন আহারাদি ও মলমূত্রাদি ত্যাগ পর্য্যন্তও নিষিদ্ধ। কারণ গ্রহণ সময়ে গ্রহদিগের রূপান্তর ঘটে। অমাবস্যা তিথিতে, জীব শরীরে তিথি পর্য্যায়ে, যে রসের হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ণিমাতে আবার পূরণ হয়; পূর্ণিমা গ্রহণে আবশ্যক মত রস, জীব শরীরে সংগ্রহ হইতে পারে না। তাহাতে দেহের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। আবার সূর্য্য গ্রহণে তেজের হ্রাস পাওয়ায়, জীবের ততোধিক শারীরিক অনিষ্ট সাধন হয়। এই অনিষ্ট নিবারণ জন্য গ্রহণকালে আহারাদি ও মলমূত্রাদি তেজ-ক্ষয়কারী কার্য্য সকল নিষিদ্ধ। মলমূত্রাদি ত্যাগে, যে কিছু না কিছু তেজের হানি হইয়া থাকে, তাহা সাধারণের বোধগম্য। কারণ ঐ কার্য্যের পর, শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তেজনা ভাব থাকে না। আহারে তেজের বৃদ্ধি করিলেও আহার সকল, তেজে পরিণত হইতে, শরীরের অনেক তেজ ব্যয়িত হয়। অধিক ভোজনশীল ব্যক্তি মাত্রেই সাধারণতঃ, অপেক্ষাকৃত কম তেজস্বী হইয়া থাকে। কারণ তাহাদের ভোজ্য-বস্তুতে যে পরিমাণ তেজ সংগ্রহ হইবে, তাহার অধিক তেজ, পরিপাক ক্রিয়ায়

ব্যয় হইয়া যায়। সেই জন্য ভোজ্য-বস্তু মধ্যে অল্প পরিমাণ তেজ উৎপন্ন হইয়া, অবশিষ্ট অংশ রস ও মেদে পরিণত হয়; আবার কতক মলরূপে বাহির হইয়া যায়। আহারে ও মলমূত্রাদি ত্যাগে, ঐ রূপ তেজ হানি হয় জন্য, গ্রহণ-কালে ঐ সকল বিধি অবশ্য পালনীয়। তৎকালে তেজ-বৃদ্ধিকর কার্য্য সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পান আহারাদি মাত্রই, তেজ হ্রাস ব্যতীত কখন বৃদ্ধি করে না। ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক হইয়া পরে তেজ উৎপাদন করে। মানবগণ দুই প্রকারে তেজ সংগ্রহে সমর্থ; এক নিয়মিত পানাহার দ্বারা, অপর ভগবচ্চিন্তা দ্বারা। নিয়মিত পান আহারে প্রথমতঃ তেজ হ্রাস হইয়া, পরে বৃদ্ধি হয়; এবং ভগবৎ চিন্তাতে কেবল মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। সেই জন্য গ্রহণ কালে ভগবৎ চিন্তাতে, অতি শুভফল প্রদান করিয়া থাকে।

একাদশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা এই তিথিত্রয় বৃদ্ধ, রোগী এবং সংযমীর পালন করা, শারীরিক বিশেষ মঙ্গল জনক। বৃদ্ধ ও রোগীর শারীরিক ক্রিয়া, প্রায় একই নিয়মে চালিত হয়। রোগীর রোগ জন্য শরীরের তেজহীনতা হইয়া থাকে; এবং বৃদ্ধের স্বভাবে তেজহানি ঘটিয়া

থাকে। রোগী যুবা হইলে, স্বভাবতেজ বৃদ্ধি সময় হেতু, নিয়ম দ্বারা তেজবৃদ্ধি করিয়া রোগমুক্ত হইয়া থাকে; এবং বৃদ্ধ, রোগী হইলে, সুনিয়ম দ্বারা নিরাময় হইতে পারে বটে, কিন্তু তেজ বৃদ্ধির আশা করা বিধি বিরুদ্ধ কার্য্য। রোগীও বৃদ্ধের তেজহীনতা জন্মিলেও, আহার বিহারাদি বিষয়ে ইচ্ছা, পূর্ব্বের ন্যায়ই বলবতী থাকে; কিন্তু সে সকল আচরণ তখন সহ্য না পাইয়া, নানা প্রকার ব্যাধির উৎপন্ন করিয়া থাকে। বিশেষ তিথি-পর্য্যায়ে অধিক রসাধিক্য বশতঃ, যন্ত্রণাদির বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে।

শুক্ল-প্রতিপদ হইতে, চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ জীব শরীরে রস বৃদ্ধি পাইয়া, একাদশী তিথি পর্য্যন্ত যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে অধিক কু-ফল প্রদান করিয়া থাকে। সেই জন্য একাদশী তিথি, উভয়েরই সর্ব্বাগ্রে অবশ্য পালনীয়। তদ্বৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, যে তিথিই হউক, তাহাও পালনীয়। অনেকে একাদশী তিথি পালন না করিয়া, মাত্র পূর্ণিমা ও অমাবস্যা পালন করেন। আবার কেহ বা অমা ও পূর্ণিমার নিশি মাত্র পালন করিয়া থাকেন। এ সকল সুস্থ দেহীর পক্ষে মন্দের ভাল হইলেও, রোগী বা বৃদ্ধের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকর। সকল বিষয়েই সংযত

হওয়া যখন সংযমীর সংকল্প, তখন তদপক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কিছুই নাই।

সুস্থ দেহী অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, তিথি সকল মানিলেও হয়, না মানিলেও ক্ষতি নাই। এ কথা সমূহ হট্‌কারী বুদ্ধি-যুক্ত লোকের উক্তি মাত্র; মূলে কোন সত্য নাই। একটা কথা উঠিতে পারে যে, অন্যান্য জীবে তিথি পালন না করায় তাহাদের শারীরিক কি অনিষ্ট হইয়া থাকে? অন্যান্য জীব সমূহের যত প্রকার যন্ত্রণা দায়ক আধি ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, তাহা মানবের কদাচ জন্মিতে পারে না। কারণ মানবগণ জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা, ঐ সকল মহাব্যাধি হইতে দূরে থাকিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ মানব-বৃত্তি সমূহে এবং অন্যান্য জীবের বৃত্তিতে, যেমন অল্প বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তেমন রোগ সমূহেও, ঐ রূপ পার্থক্য দেখা গিয়া থাকে। প্রকৃত মানব বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তি, জগতের নানারূপ গুণাগুণের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া, অগুণ ত্যাগে গুণ গ্রহণ করিয়া, আধি ব্যাধি হইতে দেহ রক্ষা করিয়া থাকে; এবং ভিন্ন বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি, নানা প্রকার কুতর্কাদির দ্বারা নিজেও অধঃপতিত হয়, এবং অন্যেরও বুদ্ধি-ভ্রম ঘটাইয়া দেয়। এই জন্যই স্মৃতি শাস্ত্রে

তিথি পালনের নানারূপ বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। শাস্ত্রে তিথি পর্ব্বাদি পালন সম্বন্ধে, বিশেষ একাদশী পালনে, নানারূপ মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। ভগবানের বিভূতি সকলের যথার্থতা নির্ণয় করা, মানবের কদাচ সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা ঐ বিভূতি সকল মধ্যে, যাহার যে অংশ মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি তদংশমাত্র লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। একারণ, শাস্ত্রবাক্য কোনটীও অযথার্থ নহে। শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও, যিনি যে প্রকারে উক্ত বিধি সকল পালন করুন না কেন, মূলে একই বস্তুর সম্বর্দ্ধনা করা হয়। যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথাবলম্বী হইয়াছেন, তাহার, তৎপথাবলম্বনেই অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে।

নীতিকথা।

(সংগ্রহ)

১। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বাকে সংযত করিবে। ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে পারিলে শান্তিরাজ্যে শীঘ্রই পৌঁছিতে পারিবে।

২। তোমরা আপনাকে আপনি জাগ্রত করিবে, আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিবে এইরূপে সতর্ক এবং আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে তোমরা সুখী হইবে। পাপ করিও না, সৎকার্য্যে রত থাকিও, অন্যের হৃদয়কে সংশোধন করিও।

৩। জলের দ্বারা কর্দ্দম উৎপন্ন হইলে তাহা, যেমন জলের দ্বারাই ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ মন কর্ত্তৃক পাপ অনুষ্ঠিত হইলে, মনের দ্বারাই তাহাকে বিনষ্ট করা যায়।

৪। ছায়া যেমন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যাঁহাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য পবিত্র, সুখ ও শান্তি কদাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।

। অন্ন ও জল নিয়মিত রূপে আহার করিলে, রক্ত

হইয়া দেহ যেমন বলবান হইতে থাকে, তেমনি ঈশ্বরবাক্য অর্থাৎ সাধু মহাজনদিগের উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়া পালন করিলে, আত্মা বলবান হইতে থাকে।

৬। রক্ত অধিকতর মন্দ হইবার পূর্ব্বে, ভাল চিকিৎসকের অধীন না হইলে, যেমন দেহ রক্ষা হয় না, তেমনই এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে পবিত্র সাধুমহাজনদিগের উপদেশ সকল গ্রহণ করিয়া, পালন না করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

৭। রোগ জানিয়া কুপথ্য করিলে, যেমন দেহের রক্ষা হয় না, সেই প্রকার পাপ জানিয়া পাপ করিলে, আত্মার নিস্তার নাই।

৮। যে সকল শিশুসন্তান মাতার হস্ত কিম্বা অঞ্চল ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহাদের যেমন কোন ভয় থাকে না, তেমনই যদি আমরা অজ্ঞান শিশুর মত বিনা বিচারে ভগবানের আদেশ অনুযায়ী চলি, তাহা হইলে আর আমাদের কোন বিপদ কিম্বা ক্লেশ ও পাপ ঘটিতে পারে না।

৯। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কেহ সিদ্ধ হইতে পারেন না; এবং সদ্গুরু ভিন্ন অন্য কেহ ধর্ম্মের পথ দেখাইতে পারেন না।

১০। আত্মা ও দেহের তত্ত্ব না করিলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাপপুণ্যের বোধ হয় না, সত্যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমতাতে স্থিতি এবং লোভে বিনাশ।

১১। ধর্ম্মের একই পথ, বড়ই দুর্গম এবং অতিশয় সূক্ষ্ম; ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহ যাইতে এবং দেখিতে পারে না। অগ্রে তাঁহার কৃপালাভের চেষ্টা করা, অতি আবশ্যক ও কর্ত্তব্য।

১২। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুকে জয় এবং মনকে বশীভূত করিয়া বৈরাগ্য পথের পথিক না হইলে, ধর্ম্মের পথ কেহ দেখিতে পায় না।

১৩। ভগবান আরাধনা মন-স্থিরতার মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্ন, মিষ্টান্ন ও ফুলচন্দনাদির দ্বারা পূজা ও আরাধনা, মন-স্থিরতার উৎকৃষ্ট উপাদান।

১৪। টাকা কড়িতে দেহের রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু, পাপ-রোগের প্রায়শ্চিত্ত, কেবল পাপকে ঘৃণা করিয়া, নিয়ত শ্রীহরির নামামৃত পানে হইয়া থাকে।

১৫। মৃত্যু ধার্ম্মিকদিগের বন্ধু এবং পাপীদিগের কাল-স্বরূপ। পাপীরা মৃত্যুকে ভয় করে, সাধকেরা মৃত্যুকে ক্রমে ক্রমে জয় করেন।

১৬। অগ্নিদ্বারা যেমন সুবর্ণ পরীক্ষিত হয়, নানাবিধ ঘটনার দ্বারা, মানব তেমনি পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

১৭। সৃষ্ট-বস্তুর সহিত মনের সংযোগে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্তরে বিবেক উজ্জ্বল না হইলে, মানব নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না।

১৯। অন্যের নিকটে সহিষ্ণুতার আশা করিলে, অগ্রে নিজে সহিষ্ণু হও।

২০। অপরিমিত ব্যয় দরিদ্রতার পূর্ব্ব লক্ষণ।

২১। আত্মীয় ব্যক্তির সহিত কখনও দেনা-পাওনা সম্বন্ধ রাখিও না।

২২। আপনাকে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিও না! অন্য ব্যক্তির অপর বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব থাকিতে পারে।

২৩। ইচ্ছামত কাজ সকল আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কখন দুঃখিত হইও না; কারণ ইচ্ছার উপর আর একজনের ইচ্ছা আছে।

২৪। উদ্দেশ্য উচ্চ রাখিবে,কিন্তু চক্ষু নিম্নদিকে রাখা চাই।

২৫। বহু অভিলাষী লোক কোন দিনও সুখী হয় না।

২৬। ঋণ করিয়া শুভাশুভ কোন কার্য্য করিও না। ঋণী ব্যক্তি কখনও মনে শান্তি পায় না।

২৭। জীবনের সত্য কর্ত্তব্য অনুসন্ধান কর।

২৮। কর্ত্তব্যপালন করিতে কখনও ভুলিও না।

২৯। কখনও অসত্যের পূজা করিও না।

৩০। কখনও স্ত্রীজাতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করিও না, জীবনে মরণে তাঁহাদের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে হয়।

৩১। কার্য্যস্রোতে পড়িয়া, যদি কখনও ক্রোধান্ধ বা হিংসাপরতন্ত্র হও, তাহা হইলে কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া করযোড়ে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে যে, প্রভু! তোমার দাসকে শাসনে রাখ।

৩২। নিজ পরিশ্রমে শাক অন্ন খাওয়াও ভাল, তথাপি কাহারও গলগ্রহ হইয়া, উপাদেয় বস্তু ভক্ষণ করা উচিত নয়।

৩৩। কুসংসর্গ অধঃপতনের প্রথম সোপান।

৩৪। কোন কার্য্য কঠিন বলিয়া পরিত্যাগ করিবে না, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে, সকল কার্য্যেই সম্পন্ন হইতে পারে।

৩৫। গুরুজনের প্রাণে কখনও আঘাত দিও না। গুরুজনের প্রাণে আঘাত দিলে কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না।

৩৬। পরনিন্দা অতিশয় নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিচয়, ঐ বৃত্তি হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে।

৩৭। দৃশ্য জগতের প্রতি, অনুরাগ হইতে মনকে ফিরাইয়া, অদৃশ্য সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে লইয়া যাওয়া মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৩৮। পবিত্র-চরিত্র লোক, সকলের নিকট আদরনীয় ও ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।

৩৯। পরধনের প্রত্যাশা করিও না। আপনার অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া, প্রাণপণে উন্নতির চেষ্টা করিবে।

৪০। প্রাণের কথা কাহাকেও বলিও না। কারণ আজ যিনি তোমার বন্ধু আছেন, কাল তিনি তোমার শত্রু হইতে পারেন।

৪১। যে সংসারে কর্ত্তার সহ্য গুণ নাই, সে সংসার কোন দিনই সুখের ও শান্তির আবাসস্থল হয় না।

৪২। পিতামাতার সেবা, মানবজীবনে কর্ত্তব্যের প্রথম সোপান।

৪৩। বিপদে স্থির থাকা, নির্য্যাতনের সময়ে নীরবে থাকা এবং মানুষের কথায় বিচলিত না হওয়া একান্ত অভ্যাস কর্ত্তব্য।

৪৪। ধৈর্য্যই, বিপদ মুক্তির সেতু-স্বরূপ।

৪৫। ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিও না, এবং ভবিষ্যৎ আশা করিয়া কাহাকেও আশ্বাস দিও না।

৪৬। শুভ কার্য্য অনুষ্ঠানে কাল ক্ষেপণ করিও না, অশুভ কার্য্য হইতে সতত দূরে থাকিবে।

৪৭। প্রাতঃকালে দিবাভাগের সৎসঙ্কল্প স্থির করিয়া শয্যাত্যাগ করিবে; এবং সন্ধ্যাকালে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সারাদিন কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। ইহাতে আত্ম পরীক্ষা বুঝিতে পারিবে।

৪৮। পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায়, বাসনা-বায়ুতে চিত্ত সর্ব্বদাই কম্পমান থাকে।

৪৯। বাসনাই সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের হেতু। বাসনা ত্যাগেই চিত্তস্থির হয়, এবং চিত্তস্থিরে সমাধি লাভ হয়।

৫০। আত্ম-চিন্তাবিহীন মানব, পশু তুল্য হয়।

৫১। সময়ের সদ্ব্যবহার করিও, কারণ মুহূর্ত্তে শেষ সময় আসিতে পারে।

৫২। মৃত্যু অন্তে এবং জন্মের পূর্ব্বে কোথায় ছিলে স্মরণ করিও, সংসারে তোমার স্থায়ী বাস নহে।

৫৩। স্বার্থত্যাগ চেয়ে ধর্ম্ম নাই এবং স্বার্থপরতা অপেক্ষা অধর্ম্ম নাই। সর্ব্বদা উত্তম পথে অগ্রসর হইবে।

৫৪। অধর্ম্মের সংসার কখনও উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে পারে না।

৫৫। সৎকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কার ত্যাগ করিবে; অহঙ্কারযুক্ত সৎকার্য্যে, শান্তি হয় না।

৫৬। গোপনীয় কথা বাহিরে প্রকাশ করা অথবা স্ত্রীলোকের নিকটে বলা, উভয়ই সমান জানিবে।

৫৭। সকলেই দণ্ড ভয়ে ধর্ম্মপথে চলে, নইলে প্রকৃত সাধু ভূতলে দুর্ল্লভ।

৫৮। মানুষ পরের দাসত্ব করিতে যাইয়া, ঝড়ে, জলে, শীতে, রৌদ্রে কতই না কষ্ট পায়। কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক ক্লেশ স্বীকার করিলেই, মেধাবী ব্যক্তি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

৫৯। যিনি বাঁচিয়া থাকিলে, শত শত লোক জীবন ধারণ করিতে পারে, তিনিই বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য। নচেৎ কেবল আত্ম-উদর পূর্ণ করিবার জন্য, পশু পক্ষীও বাঁচিয়া থাকে।

৬০। পাছে খারাপ ফল হইবে ভাবিয়া, যিনি কার্য্য আরম্ভ করিতে বিমুখ হন, তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া জানিও। কারণ আহার করিলে পাছে জীর্ণ না হয়, এই ভয়ে কে কবে আহার পরিত্যাগ করিয়াছেন?

৬১। মানব উদার হইয়া সর্ব্বদা প্রিয় কথা কহিবে

কিন্তু বীর হইয়া আত্মশ্লাঘা করিবে না। দাতা হইয়া সৎ-পাত্রে প্রচুর দান করিবে, কিন্তু সাহসী হইয়া নিষ্ঠুর হইবে না।

৬২। এ সংসারে যিনি জিতেন্দ্রিয় না হইয়াছেন, বনে গেলেও তাঁহার দোষ ঘটে। আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার গৃহে থাকিয়াও তপঃসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি বীতরাগ ও পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, গৃহই তাঁহার পক্ষে তপোবন স্বরূপ।

৬৩। বিপদ কালে যাঁহার হিতাহিত বুদ্ধি স্থির থাকে, তিনিই পণ্ডিত। কিন্তু বিপদ কালে, যাহার হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পায়, তাহার বিপদ পদে পদে।

৬৪। শত বিদ্বান হইলেও, অধিক আকাঙ্ক্ষাযুক্ত লোককে পরিত্যাগ করিবে। বহুমূল্য মণি ভূষিত হইলেও, সর্প কি ভয়ঙ্কর নহে ?

৬৫। দুষ্ট লোকের সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা কিছুই করিবে না। তপ্ত অঙ্গারে হস্ত দগ্ধ করে, পরন্তু শীতল হইলেও, উহাতে হাত কাল করে।

৬৬। যে ভৃত্য না ডাকিতেই প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং অযাচিত ভাবে, বেশী কথা বলে, ও আপনাকে প্রভুর প্রিয়পাত্র মনে করে, তাহাকে দুর্ব্বুদ্ধি লোক বলিয়া জানিবে।

৬৭। দুর্জ্জনকে যতই কেন যত্ন না কর, সে কখনও অকপট হইবে না। তৈল ও জল দ্বারা, যতই কেন কুকুরের লেজ মালিস কর না, তাহা কখনও সোজা হইবে না।

৬৮। রোগীর নিকট পথ্য আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও, ভবিষ্যতে মঙ্গল জনক। সেইরূপ, নীতি বাক্য সকল, সময়ে প্রিয় না হইলেও, তাহা শুনিয়া চলিলে, পরম মঙ্গল সাধিত হয়।

মণিমালা।

(সংগ্রহ)

১। আবদ্ধ কে ?—যে বিষয়ানুরাগী।

২। মুক্তি কি ?—বিষয়ে বিরাগই মুক্তি।

৩। ভয়ানক নরক কি ?—নিজ দেহ।

৪। স্বর্গ কি ?—বাসনা ক্ষয়।

৫। কিসে সংসার-বন্ধন ঘুচে ?—শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বারা।

৬। নরক-প্রবেশের একমাত্র পথ কি ?—নারী।

৭। কিসে স্বর্গলাভ হয় ?—জীবের প্রতি অহিংসায়।

৮। সুখে থাকে কে ?—সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি।

৯। জাগরিত কে ?—যাহার সদসৎ বিবেক আছে।

১০। কাহারা শত্রু ?—আপনার ইন্দ্রিয়গণই শত্রু।

১১। মিত্র কে ?—পরাজিত ইন্দ্রিয়গণই মিত্র।

১২। দরিদ্র কে ?—যাঁহার বলবতী আশা আছে।

১৩। ধনী কে ?—যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট চিত্ত।

১৪। কোন্ ব্যক্তি জীবন্মৃত ?—যে উৎসাহহীন।

১৫। অমৃত কি? সুখদায়িনী নিরাশা।

১৬। সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি?—মমতা এবং অভিমান।

১৭। সুরা যেমন মত্ত করে, এমন আর কিসে মত্ত করে?—নারী।

১৮। মহান্ধ কে?—যে অধিক কামাতুর।

১৯। মৃত্যু কি?—নিজের অপযশ।

২০। গুরু কে?—যিনি হিত উপদেশ দেন।

২১। শিষ্য কে?—গুরুভক্ত।

২২। দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ কি?—পুনঃ পুনঃ ভবযন্ত্রণা।

২৩। তাহা নিবারণের ঔষধ কি?—সদসৎ বিচার।

২৪। অলঙ্কার অপেক্ষা উত্তম ভূষণ কি—সচ্চরিত্রতা।

২৫। পরমতীর্থ কি?—নিজের বিশুদ্ধ মন।

২৬। কোন্ বস্তু হেয়?—কামিনী এবং কাঞ্চন।

২৭। কাহাকে সাধু বলা যায়?—সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হইয়াছেন।

২৮। প্রাণীগণের জ্বর কি?—চিন্তা।

২৯। মূর্খ কে?—যে অবিবেকী।

৩০। প্রকৃত জীবন কিরূপ?—যাহা দোষ বিবর্জ্জিত।

৩১। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কি?—যে বিদ্যা ব্রহ্মগতিপ্রদা।

৩২। জ্ঞান কাহাকে বলে?—যাহা মুক্তির হেতু।

৩৩। লাভ কাহাকে বলে?—আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

৩৪। কে জগৎ জয় করিয়াছে?—যে মন জয় করিয়াছে।

৩৫। বীর অপেক্ষা মহাবীর কে?—যে স্মরশরে বাধিত হয় না।

৩৬। প্রাজ্ঞ ধীর এবং সমদর্শী কে?—যে ললনা কটাক্ষে মোহিত হয় না।

৩৭। বিষ অপেক্ষা বিষ কি?—বিষয় সকল।

৩৮। সর্ব্বদা দুঃখী কে?—বিষয়ানুরাগী।

৩৯। ধন্য কে?—যে পরোপকারী।

৪০। সংসারের মূল কি?—চিন্তা।

৪১। বিজ্ঞ অপেক্ষা মহাবিজ্ঞতম কে?—যে নারী দ্বারা বঞ্চিত হয় না।

৪২। প্রাণীগণের শৃঙ্খল কি?—নারী।

৪৩। দিব্যব্রত কি?—সকলের নিকট দীনভাব প্রকাশ।

৪৪। পুরুষের পক্ষে কি জানা কঠিন?—নারীর মন এবং চরিত্র।

৪৫। জীব সহজে পরিহার করিতে পারেনা কি?—আশা।

৪৬। পশু কে?—যে ব্রহ্মবিদ্যা বিহীন।

৪৭। কাহার সহিত বাস করা অবিধেয়?—মূর্খ, পাপী এবং খলের সহিত বাস অকর্ত্তব্য।

৪৮। মুমুক্ষুদিগের আশু কর্ত্তব্য কি?—সৎসঙ্গ, নির্ম্মমতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি।

৪৯। মূক কে?—সত্য কথা কহিবার সময় যে সত্য কহে না।

৫০। লঘুতার মূল কি?—যাচ্ঞা।

৫১। মহত্ত্বের মূল কি?—অযাচ্ঞা।

৫২। কাহার জন্ম সফল?—যাহার পুনরায় জন্ম হইবে না।

৫৩। প্রকৃত মৃত কে?—যাহার আর মৃত্যু হইবে না।

৫৪। কোন্ ব্যক্তি বধির?—সৎকথা শ্রবণে যাহার আস্থা নাই।

৫৫। বিশ্বাসের অযোগ্য কে?—নারী।

৫৬। একমাত্র তত্ত্ব কি?—আত্মতত্ত্ব।

৫৭। উত্তম কি?—সাধু চরিত্র।

৫৮। ত্যাজ্য সুখ কি?—কামিনীসঙ্গ সুখ।

৫৯। দিবার উপযুক্ত কি?—অভয়।

৬০। তৃপ্ত হয় না কি?—আশা।

৬১। দুঃখের কারণ কি?—মমতা।

৬২। প্রকৃত ভূষণ কি?—বিদ্যা।

৬৩। কিসের বিনাশে মোক্ষ হয়?—বিকারাত্মক মনের বিনাশে।

৬৪। অতিশয় দুঃখ কি?—নিজের মূর্খতা।

৬৫। কোন কোন ব্যক্তির সেবা করা কর্ত্তব্য?—গুরু, দেবতা ও প্রাচীন ব্যক্তির।

৬৬। অন্তিম কালে সুধী ব্যক্তির আশু কর্ত্তব্য কি?—শরীর মন এবং বাক্যের দ্বারা হরিপাদপদ্ম স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

৬৭। দস্যু কাহারা?—নিজ কুবাসনা নিচয়।

৬৮। সভামধ্যে শোভা পায় কে?—বিদ্বান।

৬৯। জননীর ন্যায় সুখদায়িনী কে?—সুবিদ্যা।

৭০। কোন বস্তু দান করিলেও ক্ষয় হয় না?—বিদ্যা।

৭১। সতত কি হইতে ভীত হইবে?—লোকনিন্দা।

৭২। পরম সুহৃদ কে?—বিপদকালে সাহায্যদাতা।

৭৩। দুর্ল্লভ কি?—সদ্‌গুরু এবং প্রকৃত সাধুসঙ্গ।

৭৪। সকলের অপেক্ষা দুর্জ্জয় কি?—কাম।

৭৫। পশু অপেক্ষা মহাপশু কে?—আত্মজ্ঞান বিহীন ব্যক্তি।

৭৬। কোন্ বিষ অমৃত তুল্য বোধ হয়?—রমণী।

৭৭। মিত্রবৎ শত্রু কে?—পুত্র, কন্যা, জায়া প্রভৃতি।

৭৮। চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী কি?—ধন, যৌবন এবং জীবন।

৭৯। উৎকৃষ্ট দান কি?—নিষ্কাম দান।

৮০। কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও অকর্ত্তব্য কি?—যাহাতে অধর্ম্ম হয়।

৮১। পাপীর কর্ত্তব্য কি?—ভগবান চিন্তা।

৮২। উত্তম কর্ম্ম কি?—যাহাতে ভগবান প্রীত হন।

পরিশিষ্ট।

যে আহার দ্বারা ইহ জীবনে আয়ুবৃদ্ধি সুখ এবং পর-জীবনে শান্তি লাভ হয়, তাহাই ভোজন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

যতক্ষণ আত্মা দেহবুদ্ধি-সম্পন্ন থাকেন ততক্ষণ দৈহিক সুখ-শান্তিতে আত্মার সুখ-শান্তি বোধ হয়। পূর্ব্বজন্মাকৃত কর্ম্মানুরূপ, কেহ অধিক সত্ত্ব গুণাবলম্বী, কেহ রজঃ গুণাবলম্বী, কেহ বা অধিক তমঃ গুণশালী হইয়া থাকে। তাহাদের আহার বিহারেও গুণানুযায়ী রুচির আধিক্য হয়। গীতাতে শ্রীভগবান দৈহিক ত্রিগুণের সহিত, খাদ্য দ্রব্য ও যজ্ঞ তপস্যা এবং দানের গুণত্রয় বিভাগে, সপ্তদশ অধ্যায়ে ৭ম শ্লোক হইতে ২২শ শ্লোকে বলিয়াছেন—"সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ এবং দানও (ত্রিবিধ); তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর (৭)। আয়ু, সাত্ত্বিক ভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্ত প্রসাদ ও রুচি-বর্দ্ধক, রসযুক্ত এবং স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী, এরূপ এবং চিত্ত পরিতোষকর আহার, সাত্ত্বিক গণের প্রিয় (৮);

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী এই সকল দুঃখ মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার (৯)। শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, বিরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ক, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট, অখাদ্য যে আহার, তাহা তামসগণের প্রিয় (১০)। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তিগণ, (যজ্ঞানুষ্ঠানাদি অবশ্য কর্ত্তব্য) এই মনে করিয়া, পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণে বিধিবিহিত যে যজ্ঞাদি করেন, তাহা সাত্ত্বিক। (১১)। ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং কেবল মাত্র নিজের মহত্ত্ব খ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ করা যায়, হে ভারত শ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে (১২)। শাস্ত্রোক্ত বিধিহীন, সৎপাত্রে অন্নদান শূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামস বলে (১৩)। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই সকল শারীর তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় (১৪)। অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য এবং যাহা প্রিয় ও পরিণামে হিতকর এবং বেদাভ্যাস, এই সকল বাক্যময় তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় (১৫)। মনের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও আন্তরিক ভাব সংশোধন, এই সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় (১৬)। ফলকামনা-

শূন্য ও আত্মাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলে (১৭)। সৎকারমান পূজার্থ এবং দম্ভার্থ যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে অনিত্য ও ক্ষণিক, সেই তপস্যা রাজস বলিয়া উক্ত হয় (১৮)। অবিবেক বশতঃ, পরের বিনাশার্থ বা আত্মপীড়া দ্বারা যে তপস্যা করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয় (১৯)। দান করা উচিত, এই বোধে দেশকাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া, প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান দেওয়া যায়, সেই দান সাত্ত্বিক জানিবে (২০)। যাহা প্রত্যুপকারার্থ বা ফলের উদ্দেশ্যে পরিক্লিষ্ট ভাবে, অর্থাৎ কষ্টের সহিত দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হয় (২১)। দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সৎকারশূন্য তিরস্কার পূর্ব্বক যে দান দেওয়া যায়, তাহা তামস দান বলিয়া উক্ত হয় (২২)।

অনেকে বলিয়া থাকেন, দেশ ভেদে আহার দ্রব্য ভোজন করা আবশ্যক। তাহা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত এরূপ মনে হয় না। কারণ ইয়োরোপ খণ্ডে অনেক মনিষীগণ নিরামিষ আহারে নানারূপ উপকারিতা বুঝিয়া, নিরামিষ ভোজী হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের শরীর ও মনের অধিক উৎকর্ষতা

লাভ ভিন্ন, কোন অপকর্ষতা হয় নাই। দেশ ভেদে, ব্যবসায় বা কার্য্য ভেদে মাংসাদি আহার একান্ত দূষনীয় না হইলেও, পরমার্থিক পথে যে একান্ত বিরোধী তাহা নিশ্চয়।

অন্যস্পৃষ্ট, কেশাদিযুক্ত ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ। মধু, জল, দধি, ঘৃত, পায়স, শাক এবং ছাতু ইহাদের ভোজ্যাবশিষ্ট কদাচ কাহাকেও দিবে না।

শুদ্ধ সত্বগুণ জন্মিলে স্মৃতি লাভ হয়। স্মৃতি লাভে মুক্তি অতি নিকট হইয়া আইসে। ভগবৎ অন্বেষীর যত্ন অভ্যাস দ্বারা আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারে, সর্ব্বদা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আহারীয় দ্রব্যের দোষ বা গুণে মানুষ দেবতা বা পশু হইয়া থাকে। আহার গুণেই, কসাই বংশ-সম্ভূত অসুরের অন্তঃকরণও দেবভাবে, এবং আহারের দোষেই, ব্রাহ্মণ বংশ-সম্ভূত দেবতার অন্তঃকরণও, কসাই ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। আহারের উপরে শরীর ও মনের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে প্রত্যক্ষ ভাবে অতিদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত আছে, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বীর্য্য স্খলনে শৌর্য্য, উৎসাহ, সামর্থ্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি নষ্ট পায়; এবং বীর্য্য ধারণে, বুদ্ধিন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি

বৃদ্ধি করিয়া চিত্তের স্থিরতা লাভ করা যায় এবং কাম ক্রোধাদি রিপুবৃত্তি সকল হ্রাস পাইয়া থাকে। সাংসারিক ধর্ম্মে, আহার বিহারাদিতে এই নিয়ম পালনীয় নহে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আকাঙ্ক্ষির পক্ষে, এই নিয়ম সকল অবশ্য পালনীয়।

ধূমপানাদি মাদকদ্রব্য সেবন, ধর্ম্মপথে বিঘ্নকারী ভিন্ন কোনরূপ সহায়তাকারী নহে, ইহা নিশ্চয়।

পূজা অর্চ্চনা এবং নাম গুণাদি গান করিতে করিতে আপনা হইতে ঐ কার্য্যে মাদকতা ভাব উপস্থিত হয়;—অর্থাৎ মাদক দ্রব্য সেবনে যেমন উত্তেজনা জন্মাইয়া, মনের নানা বাসনা অনুযায়ী নানারূপ কার্য্যে উত্তেজিত করে, সেইরূপ ভগবানের নামে মাদকতা ভাব আসিলে, তখন নাম শ্রবণ-মনন মাত্র মন উত্তেজিত হইয়া, তন্নামে অধিকতর মত্ত হয়।

যাহারা মাদকাদি তীব্র দ্রব্য সেবনে ভগবানের অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে নামের মধুর মাদকতার আস্বাদ পাওয়া সুদূর পরাহত।

তীব্র দ্রব্য সেবন পর যেমন কদাচ মধুরতার আস্বাদন উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ মাদকাদি তীব্র পানাদির পর, কখনও দেবদুর্লভ বিমল মধুর নাম-সুধারসের আস্বাদ, অনুভবে

আসিতে পারে না। ইহা নিশ্চয় সত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

নাম সুধারস অতি মধুর বস্তু। তীব্ররসে মধুরতা নষ্ট করে ভিন্ন বর্দ্ধিত হয় না, সে কারণ মধুর রস আকাঙ্ক্ষীর মাদক দ্রব্যাদি বিষতুল্য বর্জ্জনীয়।